থ্রি অ্যাক্ট প্লে

আগাথা ক্রিস্টি

সূচিপত্র

ভিলি গ্রামেয়ার রেস্তোঁরা..............................2
মেসার্স ব্রিদার অ্যাণ্ড স্কাটল..............................34
তৃতীয় সফর..............................91
শেষ পর্যন্ত বসন্ত এল..............................148
বেশ পাকা হাতের কাজ..............................178
মিসেস ওয়েদারবি..............................220

ভিলি গ্রামেয়ার রেস্তোঁরা

০১.

এরকুল পোয়ারো ভিলি গ্রামেয়ার রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি একটু তুলে দিলেন তার ওভার কোটের কলারটা যদিও ঠান্ডা এমন কিছু পড়েনি তবু আজ সাবধান হওয়া ভালো, আর কোনো ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয় এই বয়সে বলে মনে করেন তিনি।

পোয়ারো ঘুমের আমেজ জড়ানো চোখে ভাবছিলেন রেস্তোঁরার কথা। সন্তর্পণে মাঝে মাঝে জিভ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন বিরাট গোঁফের নিচে প্রায় অদৃশ্য ঠোঁটে। রুমাল পকেট থেকে বের করে তিনি তার অতি প্রিয় মোটা গোঁফের ওপর বুলিয়ে নিলেন।

হ্যাঁ বেশ ভালোই হয়েছে খাওয়াটা... কিন্তু কি করা যায় এবার?

আমন্ত্রণের ভঙ্গি নিয়ে একটা ট্যাক্সি এগিয়ে এল পোয়ারোর দিকে। একটু ইতস্তত করেও শেষ পর্যন্ত নিশ্চল রইলেন পোয়ারো। কোনও দরকার আছে কি ট্যাক্সি নেওয়ার, তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন। বাড়ি যাবার তাড়া নেই কিছু এবং হাতে যথেষ্ট সময় আছে।

হতাশভাবে স্বগতোক্তি করলেন গোঁফের দিকে তাকিয়ে। সারাদিনে মাত্র তিনবারই মানুষ ভালোভাবে খেতে পারে।

সত্যি কথা বলতে গেলে, কোনোদিন জীবনে তিনি চা পান করা বরদাস্ত করতে পারেন না। তার মতে চা পান আর নৈশভোজ এ দুয়ের মাঝের সময়টুকুতে নাকি যথেষ্ট পিত্তরস ক্ষরণ হয় না। নৈশভোজের আনন্দটুকু মাটি হওয়াই নাকি চা পানের কারণ। সবাই জানে এ কথা, একজন ভোজন রসিকের কাছে সবচেয়ে উপভোগ্য নৈশভোজ।

এই হল পোয়ারোর মোটামুটি ভাবে মতামত। তিনি গোঁফে তা দিয়ে বলেন, নিজের উদর সম্পর্কে যে মানুষ সচেতন সেই বার্ধক্যে পুরস্কৃত হয়। শুধু মাত্র দৈহিক তৃপ্তির জন্যই খাওয়া নয়–এটা আসলে একটা গবেষণার জিনিস।

খাওয়ার ব্যাপারে উনি নিজে অনুসন্ধান করেন, নিত্য নতুন মুখরোচক তথা উপাদেয় খাবার কি করে পাওয়া যায়।

পোয়ারো স্বগতোক্তি করলেন, এই রকম এক ঘেয়ে সন্ধ্যা কাটানোর জন্য প্রিয় বন্ধু হেস্টিংসকে যদি পাওয়া যেত।

তিনি এরপর পাঠকমহলে অতি পরিচিত ক্যাপ্টেন হেস্টিংস ও তার মধ্যে বন্ধুপ্রীতির সুখস্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন।

আমার প্রথম বন্ধু সে, সত্যি আমায় কত সহজেই না আকৃষ্ট করতে পারে। লজ্জা নেই স্বীকার করতে আমার ভালোই লাগে নিজেকে নিয়ে ভাব করতে। আর সেটা মোটেই সুনজরে দেখে না হেস্টিংস।

ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছোটখাটো বেলজিয়ান গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো শ্যাফসবেরী অ্যাভিনিউ-এ শুরু করলেন হাঁটতে।

কেমন হয় সিনেমা গেলে–একবার ভাবলেন। নাঃ আজকাল যা সব ছবি, না আছে গল্পে বাঁধুনি না মুক্তি না গতি। দূর মোটেই ও রকম ছবি দেখা পোষায় না।

পথে একটা কাগজ কিনলেন স্টল থেকে। নতুন খবর–ম্যাগিনটি হত্যা মামলার রায় প্রকাশিত, তার কাছে এ খবরটা এমন কিছু চাঞ্চল্যকর নয় তবুও একবার তাতে চোখ বোলালেন। বয়স্কা কোনো একজন মহিলা নিহত হয়েছিলেন।

তাঁর বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছলেন পোয়ারো। নিজের সুন্দর ছিমছাম চার তলার বিরাট ফ্ল্যাটটিতে লিফটে চেপে সোজা উঠে এলেন। সঙ্গেই ছিল ল্যাকিটা–ভেতরে দরজা খুলে ঢুকতে অসুবিধে হল না।

ঘরে পা দিতেই পরিচারক ও তার একান্ত বিশ্বস্ত সঙ্গী জর্জ এগিয়ে এল।

-মঁসিয়ে শুভ সন্ধ্যা, আপনার জন্য একজন লোক অপেক্ষা করছেন।

ওভারকোটের বোঝা থেকে পোয়ারোকে ক্ষিপ্ত হস্তে মুক্ত করতে করতে বলল জর্জ।

-তাই নাকি তিনি কে?

–মিঃ স্পেন্স মঁসিয়ে।

–স্পেন্স।

পোয়ারো গোঁফে হাত বোলাতে বোলাতে বসবার ঘরে ঢুকলেন। অভ্যাগত ভদ্রলোক ওকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠলেন। চিনতে পারলেন পোয়ারো–এই স্পেন্স ছিলেন একদা ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার।

ট্রেতে জর্জ দুজনের জন্য পানীয় নিয়ে প্রবেশ করল!

পোয়ারো পান করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর, আপনি আসছেন কোত্থেকে?

–কিলচেস্টার থেকে। নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে আমার সেই বাগানের কথা....।

তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। আস্তে আস্তে বললেন, আপনার সঙ্গে আমি কিন্তু আজ বাগান সম্বন্ধে আলোচনা করতে আসিনি। আমি এসেছি মানে....একটা খুনের তদন্তে সাহায্য চাইতে আপনার। একজন স্থানীয় প্রৌঢ়, মিসেস ম্যাগিনটি মারা গেছেন।

মৃদুস্বরে পোয়ারো বললেন, কিন্তু কি ভাবে উনি মারা গেলেন?

–ভারী, কোনো জিনিস দিয়ে ওর মাথার পেছনে আঘাত করা হয়েছিল। মৃত্যুকালীন ওর সঞ্চয় তিরিশ পাউণ্ডও বেপাত্তা। উনি একাই থাকতেন। না না-ওর কাছে জেমস বেন্টলী নামে একজন যুবক ছিল পেয়িং গেস্ট হিসেবে। চাকরী চলে গিয়েছিল এই বেন্টলীর। সে দুমাসের বাড়ি ভাড়া বাকি ফেলে এই ঘটনার আগে। নিহত মহিলার তিরিশ পাউণ্ড পরে বাড়ির পিছনে একটা আলগা তক্তার নিচে পাওয়া গেছে।

.....বেন্টলীর কোটের হাতায় লেগে ছিল কিছু রক্ত আর চুল, পরে তা মিসেস ম্যাগিনটির বলে প্রমাণিত হয়েছে। বেন্টলীর বক্তব্যানুযায়ী সে নাকি মৃতার ধারে কাছেও ছিল না– তবে তার জামায় ওইগুলো কি ভাবে এলো?

জিজ্ঞাসা করলেন পোয়ারো, মৃতকে প্রথম আবিষ্কার করে কে?

উত্তর দিলেন স্পেন্স, রুটিওয়ালা। ওটা তার মাইনে পাবার দিন ছিল। দরজা খুলে দিয়ে জেমস বেন্টলী তাকে বলে যে, সে মিসেস ম্যাগিনটির শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাড়া পায়নি কোনো। হঠাৎ ভদ্রমহিলা অসুস্থ হয়ে থাকতে পারেন ভেবে তারা এরপর পাশের এক

প্রতিবেশী স্ত্রীলোকের সাহায্য নেয়। দরজা ভেঙে ফেলার পর দেখা যায় সারা ঘর লণ্ডভণ্ড, বিছানাতেও নেই তিনি। পারলারে গিয়ে দেখতে পাওয়া গেল মাটিতে পড়ে আছেন ভদ্রমহিলা মৃতাবস্থায়। তখন স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

পোয়ারো বললেন, এরপর হত্যাপরাধে বেন্টলী জেলে যায়, কেমন?

মাথা নেড়ে স্পেন্স বললেন, হ্যাঁ বিচারে জুরীরা মাত্র কুড়ি মিনিট সময় নেয় তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে। বেন্টলীকে হত্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

–তারপর ট্রেন ধরে আপনি সোজা আমার এখানে চলে আসেন কিন্তু কেন?

–হ্যাঁ ঠিক তাই। সোজা আপনার এখানেই আমি এসেছি, কারণ আমি কখনই বিশ্বাস করি না যে, এ কাজ জেমস বেন্টলী করেছে। সে......নির্দোষ।

.

০২.

চুপচাপ কাটল দু-এক মুহূর্ত।

–আমার কাছে এসেছেন আপনি...

অর্ধসমাপ্ত রাখলেন পোয়ারো মুখের কথা।

মুখ তুললেন সুপারিন্টেন্টে স্পেন্স। সাধারণ একজন গ্রামবাসী ভদ্রলোকের মত তার মুখভাব আর চোখ দুটোতে ঐকান্তিক আগ্রহ আশ্চর্য রকমের। তিনি যেন খুব ভালো করেই জানেন, কোনটা সত্যি আর কোনটা নয়।

তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন, দেখুন, আমি বহুদিন পুলিশে কাজ করেছি। আমি সহজেই মানুষের চরিত্র বুঝতে পারি। নিশ্চয়ই আপনার মনে পড়ে সেই বিখ্যাত বিখ্যাত সব মামলার কথা?..... অনেক কিছুই দেখেছি জীবনে আমি। কিন্তু..... কিছুতেই আমি ভাবতে পারছি না যে, কেন দোষী সাব্যস্ত হয়ে একজন নির্দোষ ব্যক্তি ফাঁসি কাঠে ঝুলবে। এ দৃশ্য দেখতে কিছুতেই রাজী নই আমি মঁসিয়ে পোয়ারো।

স্থির দৃষ্টিতে পোয়ারো তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বলে চললেন স্পেন্স, আমি জানি আমার কাছে আপনি এরপর কি জানতে চাইবেন। তাই আপনাকে সব খুলে বলছি। সাধারণ ভাবেই আমাকে প্রথমদিকে বলা হয়েছিল এ ব্যাপারে তদন্ত করতে। আমি ঘটনাপঞ্জী সংগ্রহ করেছিলাম তদন্তের শুরুতে। আর সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল ওই জেমস বেন্টলীর বিরুদ্ধে। সুতরাং সে জেলে যায় দোষী প্রমাণিত হয়ে। এটুকু ধারণা আমি করতে পেরেছি যে বেন্টলীকে সব্বাই দোষী জেনে খুশী।

পোয়ারো বললেন, কিন্তু আপনি নন।

ছোট্ট জবাব দিলেন। স্পেন্স, নিশ্চয়ই না।

-কিন্তু কেন? জিজ্ঞাসা করলেন পোয়ারো।

স্পেন্স দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

–আমি তা সত্যিই জানি না। এর কোনো যথাযথ কারণ আমি দেখাতে পারব না আপনাকে। তবে বেন্টলীর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছি সে নির্দোষ, সাধারণ বিচারে যা চোখে পড়েনি জুরীদের এবং সেটা সম্ভবও নয়। কিন্তু সাধারণ হত্যাকারীদের মত তার হাবভাব নয়। বড় বেশি চুপচাপ সে, বড় বেশি মনমরা। আমি কি বলতে চাইছি, মঁসিয়ে পোয়ারো বুঝতে পারছেন?

–হ্যাঁ, মিঃ স্পেন্স, জেমস বেন্টলীর কত বয়স, আর কেমনই বা তার চেহারা?

–বয়স তেত্রিশ। সাধারণ উচ্চতা, মাঝারি গায়ের রং, আর চশমা আছে চোখে।

–তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেও আমি কিছু জানতে চাই।

–সে বড্ড ভীতু আর বিষণ্ন প্রকৃতির। আসলে লাজুক, বড় এক আত্মীয় আছে তার সেও ওরকম।

তার মানে সে খুব অকর্ষণীয় নয় সব মিলিয়ে।

–নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু আমি তাই বলে কখনো চাই না যে, তার ফাঁসি হোক এই সব তুচ্ছ কারণে।

–আপনার কি মনে হয় সত্যিই শেষ পর্যন্ত ওর ফাঁসি হবে?

–কেন হবে না বলুন? সবকিছুই যে তার বিরুদ্ধে। যিনি তার পক্ষের উকিল তিনিও খুব উঁদে নন।

–সব কিছুই ওর বিরোধিতা করায় স্বপক্ষে ওর বলার মত কিছু নেই। এই তো?

–যখন কেউ সত্যিই কোনো অপরাধ করে, তার আত্মপক্ষ সমর্থনের তখনই প্রশ্ন ওঠে, তাই নয় কি?

ঠিকই বলেছেন। আমার ওপর ছিল সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের সব দায়িত্ব। আরও অস্বস্তিতে পড়েছি তাতে।

–কিন্তু আপনি কি চান আমার কাছে?

আমি চাই আমার হয়ে আপনি পূর্ণতদন্ত করুন এই হত্যাকাণ্ডের, ঠিক পারবেন আপনি। যদি খুনী না হয় বেন্টলী তবে স্পষ্টতই অন্য কেউ খুনী। আমার বিশ্বাস প্রকৃত দোষীকে নিশ্চয়ই আপনি খুঁজে বের করতে পারবেন।

–আমি আপনার অনুরোধ অবশ্যই রাখব। এই অখণ্ড অবসর বড় বেশি ক্লান্তিকর। আর কেউ যদি সত্যিই নির্দোষ হয়, তবে তার শাস্তি পাওয়াটা নিশ্চয়ই অন্যায়। মিসেস ম্যাগিনটি কবে মারা যান?

–গত বাইশে নভেম্বর।

–তবে শুরু করা যাক এখান থেকেই কি বলেন?

–নিশ্চয়ই, আপনার জন্য সব কিছু নোট করে এনেছি আমি।

–ভালো কথা। আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন হল–যদি খুন বেন্টলী না করে থাকে তবে কে করতে পারে?

সত্যি কথা বলতে কি, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

–কিন্তু মিঃ স্পেন্স, এটা ভাববার কথা। একটা না একটা উদ্দেশ্য থাকে প্রত্যেক খুনের পেছনে। এর পেছনে কি উদ্দেশ্য ছিল?

হিংসা, প্রতিশোধ, পূর্ব শত্রুতা ভয় না অর্থ? আপাতত ধরা যাক অর্থের কথাটাই। কে কে উপকৃত হবে ওই ভদ্রমহিলাটির মৃত্যুতে।

–কেউই খুব একটা উপকৃত হবে না। ওঁর যাবতীয় অর্থ মোট দুশো পাউণ্ড পাবে ওঁর ভাইঝি।

–দুশো পাউণ্ড খুব বেশি নয়। কিন্তু এটাই প্রয়োজনের সময় অনেক বেশি হতে পারে।

-ওই ভাইঝির কথাও আমরা ভেবেছি। এখন তার বয়স আটত্রিশ এবং বিবাহিতা সে। টুকিটাকি বাড়ি মেরামত এবং বাড়ি সাজানোর কাজ করে তার স্বামী। একটু বেশি কথা বললেও ভদ্রমহিলা এমনিতে তাকে বেশ সুখী বলেই মনে হয়।

-কি হল মৃতা ভদ্রমহিলার বাড়িটার?

–ভাঙা বাড়ি ওটা। উনি এখন মারা যাবার পর আর ওটা ভাড়া নিতে চায় না ওঁর ভাইঝি। নিজেদের বাড়ি আছে তাদের।

–বেশ মৃতা মহিলাটির সম্পর্কে এবারে কিছু বলুন।

বয়েস ৬৪ এবং উনি বিধবা। স্থানীয় চাকুরে ছিলেন স্বামী–প্রায় সাত বছর আগে মারা যান নিউমোনিয়ায়। ভদ্রমহিলা সেই থেকে ব্রডহিনির স্থানীয় কয়েকটা বাড়িতে গৃহস্থালীর কাজ কর্ম দেখতেন।

একজন পেয়িং গেস্ট রাখেন তিনি।

হ্যাঁ, গ্রীষ্মকালীন অতিথি আসত স্বামী মারা যাবার আগে। বেশ কয়েক মাস জেমস বেন্টলী ওখানে ছিল। বাড়ির দালাল ছিল সে। আগে অন্যত্র থাকত পঙ্গু মায়ের সাথে। মা মারা গেলে বেচে দেয় বাড়ি। শিক্ষিত বেশ কিন্তু কোনো কাজে বিশেষ দক্ষতা নেই। সে শেষ পর্যন্ত কাজ নেয় কিচেস্টারে ও পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকে। এ যাবৎ বাড়িভাড়া বাবদ কোনো গণ্ডগোল হয়নি। চাকরীটা যাবার পর বাকি ফেলেছিলো দুমাসের বাড়িভাড়া। তাকে উঠে যাবার জন্য মিসেস ম্যাগনটি চাপ দিতে শুরু করেন।

-সে কি জানত যে, ত্রিশ পাউণ্ড রাখা ছিল বাড়িতে? মিসেস ম্যাগিনটি ব্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও ওই অর্থ বাড়িতে রাখতেন কেন?

-ওর বিশেষ আস্থা ছিল না ব্যাঙ্কের ওপর। একটা আলগা তক্তার নিচে বাড়িতেই রাখা ছিল ওটা, অবশ্য তা বেন্টলী জানত বলে স্বীকার করেছে।

-ওর ভাইঝিও তা জানত কি?

–হ্যাঁ।

–আচ্ছা, যেদিন উনি মারা যান, সেদিন কি কি ঘটেছিল ঠিক বলতে পারেন?

-বাইশে নভেম্বর সন্ধ্যে সাড়ে ছটা আন্দাজ নৈশভোজ সারেন। উনি মারা যান পুলিশ সার্জেনের মতানুযায়ী সাতটা থেকে দশটার মধ্যে। যে ভুক্তাবশেষ পাওয়া যায় ওর পাকস্থলীতে তা পরীক্ষা করে মৃত্যুর সময় নির্দেশিত হয় আন্দাজ সাড়ে আটটা থেকে

নটার মধ্যে। বেন্টলী সন্ধ্যে সাতটা পনেরোতে বাড়ির বাইরে বেড়াতে বের হয়। অন্ধকার গাঢ় হবার পর তার অভ্যেস ছিল বেড়াতে যাওয়ার। বাড়ির চাবি ছিল বেন্টলীর কাছে। যদি সত্যি বলে ধরা হয় তার কথা তবে সে আন্দাজ রাত নটা বেড়িয়ে ফিরে আসে এবং তার নিজের ঘরে সোজা চলে যায়। আধঘন্টার মত বই পড়ে শুয়ে পড়ে সে। সে রাত্রে কোনো অস্বাভাবিক শব্দ শোনেনি বা তেমন কিছু চোখে পড়েনি। রান্নাঘরে সকালে কাউকে দেখতে না পেয়ে সে ধাক্কা দেয় মিসেস ম্যাগিনটির শোবার ঘরের দরজায়। প্রথমে ভেবেছিল, বোধহয় ভদ্রমহিলা ঘুমোচ্ছেন। তারপর আসে রুটিওয়ালা। আপনাকে তো পরের ঘটনা আগেই বলেছি। পাশের বাড়ি থেকে রুটিওয়ালা মিসেস এলিয়টকে ডেকে আনে। আর পারলারে তিনি মৃতাবস্থায় মিসেস ম্যাগিনটিকে আবিষ্কার করেন। মাংস কাটার বড় ছুরির মত কোনো অস্ত্র দিয়ে মাথার পেছনে ওকে আঘাত করা হয়েছিল। উনি আঘাত করার সাথে সাথেই মারা যান। ঘরের আলগা তক্তার নিচে রাখা টাকাকড়িও বেপাত্তা।

সুতরাং :- হয় ওকে বেন্টলী খুন করেছে, নয় তো বেন্টলী বেরোবার পর মিসেস ম্যাগিনটি নিজেই দরজা খুলে দেন হত্যাকারীকে।

–ঠিক কথা কাজটা ছিঁচকে চোরের নয়। কিন্তু উনি কাকে আমন্ত্রণ জানাবেন?

–হতে পারে কোনো একজন প্রতিবেশীকে বা ওঁর ভাইঝি বা ভাইঝির স্বামীকে। কিন্তু তারা নাকি ওই সময় সিনেমায় গিয়েছিল শেষের দুজনে বলেছে। এমন হতে পারে সিনেমা দেখার মাঝে হল থেকে উঠে গিয়ে তারা কেউ সাইকেলে করে ঘটনাস্থলে

আসে। কিন্তু তাই বা কি করে হবে? তাহলে বাড়ির বাইরে কেন টাকাটা লুকিয়ে রেখে গেল?

–বেন্টলীর সুযোগই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি।

–হ্যাঁ, বেন্টলীর বিরুদ্ধে সব সময়ই প্রমাণ থেকে যাচ্ছে। এমন কি তার কোটের হাতায় আবার রক্তও পাওয়া গেছে।

-সে কি কৈফিয়ত দিয়েছে এর জন্য?

–সে বলেছে ওটা মাংসের দোকানে জন্তুর রক্ত। কিন্তু দেখা গেছে পরীক্ষা করে ওটা কোনো জন্তুর রক্ত নয়।

–নিজের বক্তব্যে সে কি অবিচল ছিল?

-না, তার কোটের হাতায় রক্তের সাথে যে চুল ছিল ওই মৃতা মহিলার তাও বেন্টলী বলেছে, মৃতদেহ আবিষ্কারের পর নিচু হয়ে তা দেখার সময় লেগে থাকবে ওটা, পরে ভয়ে তার মনে ছিল না কিছুই।

-খুবই অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

–হ্যাঁ কিন্তু হতেও পারে তা। অবশ্য সাধারণ লোক তা বিশ্বাস করে না। বিশেষত মৃতদেহ দেখে ভয় পাবার ব্যাপারটা কিন্তু সেটা হতে পারে। সে বলছে, সে কল্পনাও করেনি সকালে ভদ্রমহিলার খুন হবার কথা।

–হয়ত সত্যিই বলেছে।

-এও হতে পারে যে, তার বুদ্ধিটা উকিলের দেওয়া। কিন্তু যে হোটেলে মাঝে মাঝে সে লাঞ্চ করতে যায় সেখানকার লোকও বলেছে সে বরাবর দেওয়ালের দিকের নিরিবিলি টেবিলই পছন্দ করে। একটু ভীরু প্রকৃতির নাকি।

একটানা স্পেন্স এতক্ষণ কথা বলার পর তাকালেন পোয়ারোর দিকে। কোনো উত্তর দিলেন না পোয়ারো শেষ কথার, ভুরু দুটো তার কোঁচকানো।

এরপর তারা দুজনেই কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলেন।

.

০৩.

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পোয়ারো উঠে দাঁড়ালেন।

-মিঃ স্পেন্স, অর্থের কথা ছেড়ে দিয়ে খুনের অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক এবার। মিসেস ম্যাগিনটির কি শত্রু ছিল?

–সে রকম কোনো প্রমাণ নেই।

–কি বলেন ওঁর প্রতিবেশীরা।

–তেমন কিছু নয়। মনে হয় না তো আমার কিছু তারা গোপন করেছেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠতা নেই।

–ওখানে মিসেস ম্যাগিনটি কতদিন ছিলেন?

–প্রায় কুড়ি বছর।

–আর তার আগের চল্লিশ বছর?

-উত্তর ডেভেনের এক চাষীর মেয়ে ছিলেন উনি। স্বামীর সঙ্গে বিয়ের পর প্রথমে ইলফ্রাবেগম্ব-এ ছিলেন। এখানে পরে আসেন। মানুষ হিসেবে ওর স্বামী ভালোই ছিলেন।

-মিসেস ম্যাগিনটি এসব সত্বেও নিহত হন। আচ্ছা পূর্বশত্রু হিসেবে ওর ভাইঝি কাউকে চেনে কিনা জানেন?

–সে তো বলেছে তার তেমন কেউ আছে বলে জানা নেই।

–খুব ভালো হত যদি মিসেস ম্যাগিনটি প্রকৃতই এমন ধরনের মহিলা হতেন যার রহস্যময় কোনো অতীত আছে। অর্থাৎ বলতে চাইছি অন্য প্রকৃতির মহিলা যদি উনি হতেন।

-সেরকম কোনো সম্ভাবনা নেই। সত্যিই উনি মিসেস ম্যাগিনটি–হাজার হাজার সাধারণ মহিলাদের একজন।

–কিন্তু সকলেই তারা নিহত হন।

–না, অবশ্য তা নয়।

–তবে কেন নিহত হলেন উনি? আর কেনই বা সাধারণ একজন তরুণের ঘাড়ে দোষ পড়ল সব।

–আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি যে, সব প্রমাণ ওই বেন্টলীর বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

–কিন্তু সেগুলো কি সত্যি প্রমাণ না সাজানো?

–সাজানো?

-হ্যাঁ, তাই যদি নিশ্চয়ই নির্দোষ হয় বেন্টলী তবে ব্যাপারটা সাজানো হয়েছিল এমনভাবে যাতে তার বিপক্ষে যায় সব কিছুই!

–হ্যাঁ, এবার আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি।

–তার কোটে হয়ত রক্ত আর চুল লাগার কথায় যা বলেছে সেটাই ঠিক। মানে, ইচ্ছে করে কেউ তা করেছে। এবার বেড়াতে যায় বেন্টলী এবং যখন সে বেড়াতে বেরিয়েছিল সেই সময়ই খুন হন ভদ্রমহিলা।

-আমার মনে হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে এটা।

–হয়ত। কিন্তু ব্যাপারটা সব দিক থেকেই ভেবে দেখতে হবে। একজন সাধারণ মহিলা ছিলেন মিসেস ম্যাগিনটি এবং ওঁর মধ্যে এমন কিছু আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, যে কারণে ওকে এরকম অস্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমার মনে হয় হত্যাকারীর চরিত্রগত বৈশিষ্টই এই হত্যার কারণ। আমাকে এই ধরনের হত্যাই বেশি নাড়া দেয়। মৃতের পছন্দ অপছন্দ, ভালোবাসা, কার্যকলাপ ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে চারিত্রিক বৈশিষ্ট অনেক সাহায্য করে থাকে রহস্য উদঘাটনে। যদি একবার মৃতের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিকটা জানা হয়ে যায় তবেই বলা যেতে পারে রহস্যের সূত্র হাতে এসে গেল।

তখন মনে হবে, মৃত ব্যক্তির ঠোঁট থেকে এক অত নাম উচ্চারিত হচ্ছে তা হত্যাকারীর নাম।

একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হল মিঃ স্পেন্সকে।

–ওই সব ব্যক্তিরা যারা বাইরে থেকে আসেন....

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পোয়ারো বলে চললেন, কিন্তু আমরা এখানে কি দেখছি ঠিক বিপরীত। এক আবছা ব্যক্তিত্বের আভাস পাচ্ছি আমরা, এখনো রহস্যাবৃত যার অস্তিত্ব। উনি কেমনভাবে মারা গেলেন? কেন মারা গেলেন? সে রহস্যের চাবিকাঠির খোঁজ আমরা পাব না মৃতার জীবন কাহিনীর মধ্যে। হত্যাকারীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যর মধ্যে তার সূত্র লুকিয়ে আছে। আপনি কি আমার সাথে একমত?

–আমরাও তাই ধারণা। পোয়ারোর বক্তব্য সতর্ক স্পেন্স সমর্থন করেন।

–কেউ চেয়েছিল হয় মিসেস ম্যাগিনটি নয় ওই জেমস বেন্টলীকে হত্যা করতে। কিন্তু কাকে?

-সত্যিই কি আপনি মনে করেন কাউকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার উদ্দেশ্যেই মিসেস ম্যাগিনটির মত একজন নির্দোষ মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে?

–হয়তো বেন্টলীকে শাস্তি দিতেই হত্যা করেছে সে ওই ভদ্রমহিলাকে। অতীত সম্বন্ধে ছেলেটির কিছু কি জানতে পেরেছেন?

–বিশেষ কিছু নয়। ন বছর বয়সে মারা যান বাবা। ডাক্তার ছিলেন তিনি। ছেলেটি তারপর পড়াশুনা করে। সেনাবাহিনীতে প্রবশোধিকার পায় না দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য। কর্তৃত্ব প্রিয় মায়ের সঙ্গে থাকত। রাষ্ট্রদপ্তরের কোনো একটা বিভাগে যুদ্ধের সময় চাকরী করেছিল।

–আমার মনে হয় বেন্টলীর অতীত সম্বন্ধে ভালো করে আরও খোঁজ খবর নিন। হয়ত তাতে বেশি ফল হবে।

-সত্যিই কি আপনি তাই মনে করেন?

–এখনো আমি কিছুই বিশ্বাস করি না। দুটো পথ আছে। তার মধ্যে কোনটাকে অনুসরণ করা হবে, আমাদের খুব তাড়াতাড়ি তা স্থির করা দরকার।

–কোন পদ্ধতিতে আপনি এগোতে চান? আপনার কোনো কাজে কি আমি লাগতে পারি?

–আমি প্রথমে ব্রেন্টুলীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। –সেটা সম্ভব। ওর সলিসিটারের সাহায্য নেব আমি।

-তারপর ঘটনার তদন্ত করতে চাই–যদি কোনো তথ্য পাওয়া যায় পরিবেশ থেকে। ব্রডহিনির ঘটনাস্থল দেখা দরকার আমার।

হ্যাঁ, বলা যায় না, কোনো সূত্র হয়ত আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছে।

-আসলে তা নয়। মানুষের মানসিক প্রতিক্রিয়া এক রকম হয় না সকলের। অভিজ্ঞতাও তাই। হয়ত ঘটনার পরিবেশ বিশেষ কোনো ইঙ্গিত দেবে আমাকে, যেদিকে নজর ছিল না আমাদের। যাক অনুমান আর সম্বাবনার তালিকাটি ধীরে ধীরে আমি ছোট করে ফেলতে চাই। আচ্ছা, ওখানে আপনাদের কোনো সস্তা অথচ ভালো হোটেল আছে?

–গেস্ট হাউস আছে একটা মানে ওইরকম আর কি অনেকটা। সেটার দেখা শুননা করে এক তরুণ দম্পতি যদিও মনে হয় না ওটা খুব ভালো।

-আর কি করা যায়। অসুবিধে হলেও সইতে হবে।

ওখানে কি আপনি মিথ্যা পরিচয়ে যাবেন? যেমন ধরুণ একজন অপেরা গায়ক হিসেবে নিজের পরিচয় দিলেন বা বিশ্রামের জন্য গেছেন?

-কখনই না।

-কিন্তু!

—-কোনো কিন্তু নেই এর মধ্যে। যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে অথচ আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু ভান করতে হবে এমন যেন অনেকটাই আমাদের জানা এ ব্যাপারটার রহস্য। সেই—সত্যান্বেষী এরকুল পোয়ারো যে মোটেই সন্তুষ্ট নয় বিচারের রায়ে এবং আগ্রহী প্রকৃত রহস্যে ভেদে। তদন্ত করব আমি।

-তারপর?

–লক্ষ্য করব তদন্তের প্রতিক্রিয়া। নিশ্চয়ই কিছু সূত্র পাব। অস্বস্তিবোধ করছিলেন মিঃ স্পেন্স। তিনি পোয়ারোকে সর্তক করলেন।

–ঝুঁকি নেবেন না বেশি। আপনার কিছু ক্ষতি হয় আমি চাই না।

–সত্যি যদি তেমন কিছু ঘটে তবে তো পরিষ্কার বোঝা যাবে অন্য লোক হত্যাকারী।

–এইভাবে আমি তা জানতে চাই না।

.

০৪.

পোয়ারো ভীষণ অপ্রসন্ন মুখে ঘরের চারধার দেখছিলেন। আলো হাওয়া যথেষ্ট থাকা সত্বেও অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন ঘরটা। তিনি বিরস মুখে বুককেসের ওপর রাখা নিজের

ধুলোমাখা হাতটা সরিয়ে আনলেন। একটা সোফার ওপর চটে গিয়ে বসতেই আর্তনাদ করে উঠল সেটার স্প্রিংগুলো।

বেশ বড়ই ঘরটা কিন্তু সব মিলিয়ে যেন কেমন। অনেক ফুটো কার্পেটটায়। ওটার নক্সাটা ভালো অবস্থাতেই যে অতি বাজে ছিল তা বেশ বোঝা যায়, ভাঙা পায়ার দৌলতে টেবিলটা নড়বড় করছে। ও পাশের দুটো চেয়ারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভদ্রস্থ, বিবর্ণ হয়ে গেছে। চেয়ারের ঢাকনাগুলো। একটা ভোলা জানলা যা বন্ধ করা কারও শক্তিতে কুলোবে বলে মনে হয় না। অর্ধেক ভাঙা দরজার খিল, কি করে প্রয়োজনে দরজাটা বন্ধ করা যাবে তা জানেন ভগবানই। কতকগুলো স্টিলের খোদাই করা ঘর সাজানোর জিনিস যা দেওয়ালে বাঁকাভাবে ঝুলছে সেগুলোর বিষয়বস্তু অত্যন্ত অসার। তেল রঙের দু চারটে ছবি অবশ্যই ওরই মধ্যে একটু যা ভালো। এর ওপর একটা ভীষণ দর্শন কুকুর মাঝে মাঝেই পোয়ারোর দিকে ঘরে। ঢুকে তাকাচ্ছিল বিরসমুখে।

–কি অসুবিধেই না হচ্ছে... উঃ, এখন আমাকে এইসব অসুবিধে সহ্য করতে হবে।

খেদের সুরে এরকুল পোয়ারো স্বগতোক্তি করলেন।

দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল।

একঝলক দমকা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস সামারহেস ঘরে ঢুকলেন। ঘরের চারদিকে লক্ষ্য করে দেখে দূরের কারও উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

লাল চুল ভদ্রমহিলার, দাগে ভরা মুখ হলেও মোটামুটি আকর্ষণীয় চেহারাটা। আর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা চোখে পড়ে যেন সব সময়ই উনি কিছু খুঁজছেন। উনি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই দরজাটা পোয়ারো লাফিয়ে উঠে বন্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

ভদ্রমহিলা দু-এক মুহূর্ত বাদেই ঘরে ঢুকলেন আবার। মস্ত এক জলের পাত্র আর ছুরি ছিল হাতে।

এক ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল দূর থেকে।

-মরিন, আবার অসুখ করেছে বেড়ালটার।

–আসছি এখুনি, ভালো করে ওকে ধরে রাখো।

হাতের জিনিস দুটো পোয়ারোর ঘরেই নামিয়ে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেলেন উনি।

আবার পেয়ারো উঠে গিয়ে ভেজিয়ে দিলেন দরজা। মাথা নেড়ে হতাশ ভাবে বললেন, উঃ ভোগান্তি আছে দেখছি কপালে।

কানে একটা গাড়ির শব্দ যেতেই ঐ কুকুরটা জানলার ধারের ছোট টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠল আর সশব্দে টেবিলটা নড়ে উঠল।

-অসহ্য।

আবার খুলে গেল দরজাটা আর চেঁচাতে চেঁচাতে কুকুরটাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

মরিন সামারহেসের কণ্ঠস্বর গেল শোনা।

-জানি, তুমি পেছনের দরজাটা আবার খুলে রেখেছে। দেখছ না, ঢুকে যাবে মুরগীগুলো।

হতাশভাবে পোয়ারো বললেন, আমাকে সাত গিনি করে খরচ করতে হবে এই চমৎকার পরিবেশের জন্য।

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। মুরগীগুলোর বিশ্রী চিৎকার দূর থেকে জানলা দিয়ে ভেসে আসছিল। মরিন দরজা খুলে আবার ঘরে ঢুকলেন।

-ওমা, দেখছি এখানেই বটি আর ছুরি ফেলে গেছি। আমার ভুলো মন। মঁসিয়ে, বীনগুলো এখানে বসে কাটলে আপনার কি আপত্তি হবে? আঁশটে গন্ধ রান্নাঘরের আমি আবার মোটে পারি না সহ্য করতে।

–না না মাদাম, খুব খুশী হব আমি।

এটা যদিও পোয়ারোর মনের কথা নয় কিন্তু পৌঁছনোর ২৪ ঘন্টা বাদে এই প্রথম একজনের সাথে কথা বলতে পেরে যেন বাঁচলেন উনি।

একটা চেয়ারে ধপাস করে বসে তরকারি কুচোতে লাগলেন ভদ্রমহিলা। বললেন। মনে হয় আমার আপনার খুবই অসুবিধে হচ্ছে এখানে। আসবাব বা অন্য কিছু যদি বদলাতে চান তবে নিশ্চয়ই বলবেন। আর একটু হলেই পোয়ারো বলে ফেলছিলেন যে সম্ভব হলে এই গৃহকর্ত্রীটিকেই তিনি বদলাতে চান। মনের ভাব গোপন করে তিনি বললেন, না না,

কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। আপনাকে ঘরের কাজে সাহায্য করবার মত যদি কাউকে যোগাড় করে দিতে পারতাম তা হলে নিজেরই ভালো লাগতো।

-হায়রে, তেমন আর কোথায় পাওয়া যাবে। কপালটাই আমাদের মন্দ। গৃহস্থালির কাজকর্ম যিনি আমাদের করতেন হঠাৎ তিনি খুন হয়েছেন।

মিসেস ম্যাগিনটি? মহিলার মুখের কথা পোয়ারো প্রায় লুফে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

–হ্যাঁ, আমি ওঁকে খুব পছন্দ করতাম। ওঁকে ছাড়া আমার কাজ চালাতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। হঠাৎ ওরকম একটা ঘটনায় তো শুরু হয়ে গেল দারুণ তোলপাড়। নেহাতই আমাদের কপাল খারাপ। ওঁর অভাবে আমাদেরই লোকসান।

-তা হলে ওঁকে আপনি পছন্দ করতেন?

–অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন উনি। কাজকর্ম করতেন ঘড়ির কাঁটা ধরে। যাকে এখন পেয়েছি তিনি সংসারী মানুষ। পাঁচটি ছেলেপুলে আর স্বামীর ঝামেলা সামলিয়ে তার আর এখানে বিশেষ সময় দেওয়া চলে না আমার। কিন্তু সেসব বালাই ছিল না ঐ ভদ্রমহিলার।

-উনি কি সব সময়ই বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন।

-হ্যাঁ, ওর একটুও হাতটান ছিল না। তবে সামান্য কৌতূহলপ্রবণ মহিলা ছিলেন। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। একঘেয়ে জীবন ছিল তো।

–সত্যিই কি কোনো বৈচিত্র্য ছিল না ওর জীবনে?

–একেবারেই না। প্রতিদিন ভোরে ওরকম পাহাড় প্রমাণ কাজ করতে হলে আমার তো বেঁচে থাকার ইচ্ছেই লোপ পেয়ে যেত।

জানলা দিয়ে মেজর সামারহেস উঁকি মারলেন। মরিন তাঁর দিকে এক লাফে ছুটে গিয়ে হাট করে জানলাটা খুলে দিলেন। তাড়াহুড়োর চোটে কোঁটা তরকারি ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক।

-মরিন, হতচ্ছাড়া কুকুরটা আবার খেয়ে ফেলেছে মুরগীগুলোর খাবার।

সর্বনাশ ওর যে অসুখ করবে। তার সবজির ঝুড়ি দেখলেন জন সামারহেস। মরিন খুশী হল না শাকের পরিমাণ দেখে। সেদিন মাছ তখনো আসেনি। থাকতে হবে টিনের মাছের ভরসায়। স্বামী-স্ত্রী এসব চিন্তায় ত্রস্তপদে চলে গেলেন সেখান থেকে।

উঠে গিয়ে পোয়ারো জানলা দিলেন বন্ধ করে। স্বামী-স্ত্রীর কথা ভেসে আসছিল দূর থেকে।

-আচ্ছা মরিন, কি খবর আগুন্তুক ভদ্রলোকের? আমার ওঁকে যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে। নতুন এই অতিথিটির নাম কি গো?

–মিঃ এরকুল পোয়ারো। ফরাসী উনি।

–যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে নামটা।

–বোধহয় ভদ্রলোক কোনো চালের দোকানে কাজ করেন, চেহারাটা ওর রকমই। মুখ কুঁচকোলেন পোয়ারো।

–না না। বোধহয় আচারের দোকানে। ঠিক ধরতে পারছি না তবে চেনা লাগছে, বাপু সপ্তাহের পুরো টাকাটা আদায় করে রেখো। আর ওঁদের কথা শোনা গেল না।

ছড়িয়ে পড়া কোটা বীনগুলো পোয়ারো কুড়োতে লাগলেন। মরিন ঘরে ঢোকা মাত্র তিনি সেগুলো তার দিকে এগিয়ে দিলেন।

–অসংখ্য ধন্যবাদ। মনে হচ্ছে এগুলো খারাপ হয়ে গেছে, আর চলবে না।

–অনুমতি যদি করেন তো লাগিয়ে দিই দরজাটা। বাতাস আসছে।

-মিঃ পোয়ারো কেবলই দরজা বন্ধ করতে ভুলে যাই। প্রথমে এখানে আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী থাকতেন। তারা কখনো বাড়িটা মেরামত করাননি। অবশ্য তাদের সে সঙ্গতি ছিল না। এখন বাড়িটার অবস্থা ঝরঝরে। যখন এখানে ভারতবর্ষ থেকে এলাম, সাধ্যে আমাদেরও কুলোয়নি যে এটা মেরামত করি। তবে যখন ছেলে মেয়েরা ছুটিতে আসে ফুর্তিতে কাটিয়ে যায় অঢেল জায়গা পেয়ে। বাগানও আছে। পেয়িংগেস্ট রেখে বাকি জায়গায় ভালোভাবেই কুলিয়ে যায় আমাদের।

–আমিই বোধ হয় বর্তমানে একমাত্র অতিথি আপনাদের?

-না, একজন বৃদ্ধা আছেন ওপরে। যেদিন উনি এখানে আসেন প্রথম, সেদিন থেকেই ওপরে। ভীষণ অসুখ নাকি যদিও তা আমি কিছুই বুঝি না। সব অসুখ সেরে যায় খাবার সময়। খাবার চার বেলা পৌঁছে দেওয়াই আমার কাজ। শুনছি এক ভাগনি বা অন্য কারো কাছে উনি কালই চলে যাবেন।

একটু থেমে কিন্তু কিন্তু ভাব করে আবার বললেন, আচ্ছা আজ কি আপনার ভাড়াটা দেবেন, এখন আবার আমার একটু অসুবিধে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই সপ্তাহখানেক থাকছেন।

–সম্ভবত বেশিদিন।

সাতগিনি দিয়ে দিলেন পোয়ারো, তাকে ধন্যবাদ জানাতে বললেন মরিন, আমার পরিচয় দিচ্ছি আপনাকে আমি এরকুল পোয়ারো।

কোনো ঔৎসুক্য দেখালেন না মরিন। বললেন, সুন্দর নাম। এটা তো গ্রীক নাম, তাই না?

আঙুল নিজের বুকে ঠেকিয়ে পোয়ারো বললেন, একজন ডিটেকটিভ আমি, বোধ হয় দুর্বলশ্রেষ্ঠ।

বিস্ময়ে আর আনন্দে মরিন চিৎকার করে উঠলেন। বেশ মজার মানুষ তো আপনি। কিসের অনুসন্ধান করছেন–সিগারেটের ছাই না পায়ের চিহ্ন?

দেখুন কোনো মজার ব্যাপার নয় এটি। আমি এখানে এসেছি মিসেস ম্যাগিনটির হত্যার তদন্তে।

উঃ কেটে গেল হাতটা। মরিন চোখের সামনে আঙুল তুলে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, একথা কি সত্যি? কিন্তু এখন তো শেষ হয়ে গেছে সব। বেচারী পেয়িংগেস্ট ধরাও পড়েছে, বিচারও শেষ। ওর তো শুনছি ফাঁসি হবে বলে। হয়তো হয়েও গেছে এতদিনে।

-না মাদাম, এখনো হয়নি। আর সব শেষ হয়ে যায়নি।

রহস্যের যবনিকা পতন হয় সত্য উদঘাটনেই–কাজেই এখনই নিষ্পত্তি হতে পারে না ম্যাগিনটি হত্যা মামলার।

-ও।

হঠাৎ মরিন তার কোলের ওপর রাখা তরকারির বটির দিকে কেমন মনোযোগ দিলেন।

-ইস, আঙুলের রক্ত লেগে গেল দেখছি বীনগুলোর মধ্যে। যাকগে, সেদ্ধ করলে খাওয়া চলবে, কি বলেন কোনো ভয় নেই সেদ্ধ হলে তাই না? আপনার টিনের খাবারও তো চলবে?

–আমি আজ লাঞ্চের সময় থাকব না।

.

০৫.

মনে হয় না আমার আপনাকে আমি নতুন কিছু খবর দিতে পারব।–মিসেস বার্চ বললেন। মিঃ পোয়ারো বিদেশী দেখে তিনি স্বভাবতই একটু যেন ক্ষুণ্ণ।

নিহত হয়েছেন আমার পিসীমা, খবই দুঃখের ব্যাপার। এ ব্যাপারে আমার শ্বাশুড়ী তো খুবই বিরক্ত। কথা শোনাচ্ছেন সর্বদাই এরকম বিশ্রী ঘটনা ওর পরিবারে কখনো ঘটেনি। অথচ একবার ভাবুন তো আমার দিকটা? নিজের পিসী তো বটে। যাক গে আমার মনে হয় শেষ হয়ে গেছে ব্যাপারটা।

-কিন্তু জেমস বেন্টলী যদি নির্দোষ হয়?

-না না, তা হয় কি করে? ওকে তো আমার কখনো সুবিধের মনে হত না। কেমন কেমন। পিসীকে অনেক আগেই বলেছিলাম ওকে বাড়িছাড়া করতে। নিজের মনে বিড়বিড় করত। কেন যে পিসী থাকতে দিয়েছিল। ও নাকি মোটেও ঝামেলা করে না। মদ সিগারেটের নেশা নেই। এখন পিসীর আত্মাই জানছে কেমন ও।

চিন্তিতভাবে পোয়ারো তাকালেন মহিলাটির দিকে। বেশ ছিমছাম উনি। বাড়িটা বেশ পরিষ্কার, সুগৃহিণী ভদ্রমহিলা বোঝা যায়। একটু খুঁতখুঁতে তবে কারও মাথাটায় উনি কখনো আঘাত করে হত্যা করতে পারবেন না এ বিষয়ে স্বামীকে প্ররোচিত করতে পারেন ভাবতেও অসুবিধা হচ্ছে। এদের অতীত জীবন খুঁটিয়ে দেখেছেন মিঃ স্পেন্স। এদের দিক থেকে হত্যা করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই বলে মনে হয়েছে তাঁর। মিসেস

বেমি বার্চ সম্বন্ধে পোয়ারো মোটামুটি একটা ধারণা করে নিচ্ছিলেন। সম্পর্ক ভালোই ছিল পিসী ভাইঝির মধ্যে, বেমি জানেন যে পিসীর মৃত্যুর পর তিনিই পাবেন পিসীর সঞ্চিত অর্থ, কিন্তু তিনি সেজন্য মোটেই ব্যস্ত নন।

পোয়ারো প্রসঙ্গ পালটিয়ে নিহত মহিলার স্বাস্থ্য এবং স্বভাব সম্পর্কে জানতে চাইলেন খুঁটিনাটি। কাজে নাও লাগতে পারে এসব তথ্য তবু খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার চেষ্টা চালালেন। তিনি।

কথায় কথায় বোঝা গেল পিসীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাদের বিশেষ ছিল না। মাঝে মধ্যে এক আধবার যাতায়াত হত এই পর্যন্ত এবং বড়দিনে উপহার বিনিময়। যেটুকু পারিবারিক সম্পর্ক থাকার সেটুকুই ছিল। উনি জানতেন পিসীর মৃত্যুর পর তার সঞ্চিত অর্থ তাকেই বর্তাবে তবে তিনি আগ্রহী নন তার জন্য। বুনতে ভালোবাসতেন পিসী। কুকুর পছন্দ করতেন না তবে একটা বেড়াল ছিল তার। তিনি কয়েকটা বাড়িতে টুকটাক গৃহস্থালীর কাজ করতেন।

পোয়ারো জিজ্ঞাসা করলেন, সামারহেসদের বাড়িতে?

-হ্যাঁ, তিনি ওখানেও দুদিন যেতেন সপ্তাহে। ওরা চলে এসেছেন ভারতবর্ষ থেকে। এখানে সাহায্য করবার মত ওঁদের কাজের লোক ছিল না। ছেলেমেয়েরা বাড়িতে থাকলে একেবারে হুলুস্থুলু বাধায় তারা। তবু আমার পিসী মিসেস সামারহেসকে পছন্দ করতেন। খুব পরিষ্কার ছিলেন পিসী। কাচ্চাবাচ্চা ভালোবাসতেন।

গীর্জায় যেতেন প্রতি রবিবার। মাঝে মাঝে সিনেমাতেও যেতেন, ঔৎসুক্য ছিল চিত্রতারকাদের সম্বন্ধে। এক শিল্পী আর তার স্ত্রীকে এড়িয়ে চলতেন তিনি যখন জানতে পারলেন যে সামাজিক বিবাহ তাদের হয়নি। রবিবারের কাগজ পুরোনো পত্রিকা সংগ্রহ করে পড়তে ভালোবাসতেন। নিজে বিশেষ খরচ করতেন না পোশাকের জন্য। প্রচুর পাওয়া জামা কাপড়ও ছিল আর বাতিক ছিল তা জমিয়ে রাখা।

পোয়ারো বুঝতে পারলেন যে সত্যিই সব কথা। তার মৃতার সম্বন্ধে সত্যিই এরকমই একটা ধারণা হয়েছিল। উঠতে যাবেন তিনি ঠিক এমন সময় মিঃ বার্চ বাড়ি ফিরলেন। ঘরের ভেতরে এলেন একটু অপ্রস্তুত ভাবে।

মানুষটি ছোটোখাটো। ব্যাপার শুনে ওকে ওর স্ত্রীর মত মনে হল না অতটা বিচলিত। পুলিশকে সাহায্য করতে তিনি যেন বেশি আগ্রহ দেখালেন। সেটা মিঃ স্পেন্সের চিঠি দেখেও হতে পারে। কিন্তু ওর মধ্যে কোথায় যেন একটু অস্বস্তির ভাব আছে বলে মনে হচ্ছে। সেটা অন্য কোনো কারণেও থাকতে পারে। এমন হতে পারে সিনেমায় যাবার অ্যালিবাই সাজানো। হল থেকে কোনো এক ফাঁকে বেরিয়ে এসে কাজ সেরে গেছেন। মিসেস ম্যাগিনটি দরজা খুলে দিয়েছেন। হত্যা করার পর সব ব্যাপারটাকে যাতে নিছক ডাকাতি বলে মনে হয়, হয়তো এমনভাবে সাজানো ওরই কাজ। ধারালো ভারী অস্ত্রটি কিন্তু ঘটনাস্থল বা আশেপাশের ঝোঁপঝাড়, পুকুরের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু কেন? হত্যার ছাপ বা চিহ্ন না রেখেও তো খুন করা যায়। কেন খুঁজে পাওয়া গেল না অস্ত্রটা? তবে কি জো বার্চ লুকিয়ে রেখেছেন সেটা?

নিঃসন্দেহ নন পোয়ারো কিন্তু মনের কোণায় তবুও সন্দেহে যেন উঁকি মারছে। ঠিক মাংস কুচোবার ছুরি ওই ধরনের হবে বলে মনে হয় না। তার থেকে সামান্য অন্যরকম এবং ওটা কার হতে পারে ওই বিশেষত্বটুকুই বুঝিয়ে দেবে।

ওই ধরনের বেন্টলীর কিছু ছিল বলে খবর নেই। এটা বেন্টলীর নির্দেশিত তার পক্ষে যাবার মত একটা খুব ছোট যুক্তি। বিরুদ্ধে যাওয়া অন্যান্য সব সাক্ষ্য প্রমাণের মত ততটা ভারী ওজন না হলেও এটা নিঃসন্দেহে তার পক্ষে যাবে। পোয়ারো তার অভ্যস্ত চতুর চোখ দ্রুত বৈঠকখানার সর্বত্র বুলিয়ে নিলেন।

মেসার্স ব্রিদার অ্যাণ্ড স্কাটল

০৬.

মেসার্স ব্রিদার অ্যাণ্ড স্কাটল-এর অফিসে মিঃ পোয়ারো প্রবেশ করলেন।

অত্যন্ত অমায়িক মানুষ মিঃ স্কাটল। তিনি হাত ঘষতে ঘষতে বললেন, সুপ্রভাত, সুপ্রভাত। বলুন কি করতে পারি আপনার জন্য মঁসিয়ে?

ভদ্রলোক পোয়ারোকে এক নজরে দেখে তার সম্বন্ধে ধারণা করতে চেষ্টা করলেন।

–মিঃ স্কাটল, নিশ্চয়ই আমি আপনার সময় নষ্ট করছি না। জেমস বেন্টলীর সম্বন্ধে কিছু খবর জানতে এসেছি আমি।

–আপনি রিপোর্টার না পুলিশ?

–না। এ ব্যাপারে বেন্টলীর এক আত্মীয় আমাকে তদন্ত করতে বলেছেন।

–কোনো নিকটাত্মীয় বেন্টলীর আছে বলে তো শুনিনি?

আর বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড হয়েছে তো বেন্টলীর। আপনি জানেন না?

–এখনো কার্যকরী হয়নি দণ্ড। যতক্ষণ শ্বাস, আশ ততক্ষণই নয় কি? অবশ্য ওর বিরুদ্ধে তো সেই প্রমাণ।

–এই আত্মীয়টি ওর কে?

–তিনি অবশ্যই ধনী।

–আপনি দেখছি মশাই অবাক করলেন। ধনী কথাটায় মিঃ স্কাটল নড়েচড়ে বসলেন।

পোয়ারো বললেন, ছেলেকে নিয়ে মিসেস বেন্টলী পরিবার ছেড়ে অনেক দূরে চলে আসায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এদের সঙ্গে।

–তা হলে তো খুবই দুঃখের ব্যাপার যে বেন্টলীকে বাঁচাতে কেউ এতদিন এগিয়ে আসেনি।

–জানতে পারা মাত্র তারা তদন্তের ভার দিয়েছেন আমাকে।

–কিন্তু বুঝতে পারছি না, আপনাদের আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

সামনের দিকে পোয়ারো ঝুঁকে পড়লেন–শুনুন আপনাদের এখানে বেন্টলী কাজ করতো মিঃ স্কাটল। কিছু বলুন ওর সম্বন্ধে।

–বিশেষ কিছু নেই ওর সম্বন্ধে বলার মত। ও আমার অধস্তন কর্মচারীদের মধ্যে একজন। বেশ ভালোই ছিল। অন্তত বিরুদ্ধে বলবার মত কিছু নেই। তবে কি জানেন? আমরা হলাম বাড়ি বিক্রির এজেন্ট। তেমন তুখোড় ছিল না সে এ বিষয়ে। আমাদের

ব্যবসায় কথার চালে খদ্দেরদের মত করতে হয়, তাদের মনস্তত্ত্ব বুঝে এগোতে পারলে কাজ হতে হয়। এদিকটা বেন্টলী ঠিক তেমনভাবে কায়দা....

মিঃ স্কাটলকে পোয়ারো কথা শেষ করতে দিলেন না। মনস্তত্ত্ব কথাটা তার সতর্কতা বাড়িয়ে তুলল।

-সত্যিই কি আপনার মনে হয় যে, ওই কর্মচারীটি একজন খুনী?

চমকে উঠে স্কাটল বললেন, নিশ্চয়ই, তবে সত্যি কথা বলতে গেলে তাকে মানসিক দিক দিয়ে খুনী বলে মনে করি না আমি, বড্ড নরম প্রকৃতির ও।

–আপনারা ওকে বরখাস্ত করেন?

–দেখুন, আমাদের তা করতে হয়েছিল ব্যবসার খাতিরে মোটেও ও জনপ্রিয় ছিল না।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে পোয়ারো অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন, জনপ্রিয় ছিল না ছেলেটি অর্থাৎ খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারার মত সাধারণ কিছু গুণের অভাব ছিল তার।

একথা পোয়ারো ভেবে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন যে, এ যাবৎ যে সব খুনীদের তিনি জেনেছেন তাদের অধিকাংশই জানাশুনো সাধারণ লোকেদের মুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখত।

–ক্ষমা করবেন, আপনার সাথে কি একটু কথা বলতে পারি?

ব্লু ক্যাট রেস্তোরাঁর আলো আঁধারি ঘরে বসে পোয়ারো চোখ বোলাচ্ছিলেন মেনুকার্ডে। হঠাৎ চমকে উঠলেন নারী কণ্ঠস্বর শুনে। এক তরুণী সামনে দাঁড়ানো, সোনালী চুল মাথাভর্তি, একটা ঝকঝকে নীল পশমী জামা গায়ে, পোয়ারোর মনে হল একে কিছুক্ষণ আগেই তিনি দেখেছেন।

তরুণীটি বলল, মিঃ স্কাটলের অফিসে সব কথাই আপনার শুনেছি।

খুনের তদন্তের ব্যাপারটা পাঁচকান হোক পোয়ারো সেটা মনে মনে চাইছিলেন। তরুণীটির কথা শুনে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি পার্টিশানের ধারে টাইপ করছিলেন, আমি দেখেছি।

সম্মতির ভঙ্গিতে তরুণী ঘাড় হেলাল। সাদা ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসলও। বেশ স্বাস্থ্যবতী সে, তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর বয়স হবে।

–মিঃ বেন্টলীর সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই।

–কি বলতে চান?

–সত্যিই কি উনি আপিল করবেন? অন্যরকম সাক্ষ্য প্রমাণ কিছু পাওয়া গেছে বুঝি? ঈশ্বর করেন যেন তাই হয়। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি না উনি এ কাজ করেছেন।

মৃদুস্বরে পোয়ারো বললেন, আপনি তা হলে এ কথা সত্যিই বিশ্বাস করেন না?

–দেখুন, আমি প্রথম প্রথম কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু প্রমাণগুলো যে সবই ওঁর বিরুদ্ধে। তাই ওকেই খুনী বলা ছাড়া উপায় কি? আমার ধারণা তখন উনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন।

–একটু কি অদ্ভুত প্রকৃতির বেন্টলী?

–না না, বরং বলতে পারেন একটু বেশি লাজুক। আসলে আত্মবিশ্বাস নেই ওর। মেয়েটির দিকে পোয়ারো তাকালেন। ওকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হল তার।

–আপনি কি পছন্দ করতেন ওকে?

–হ্যাঁ, তা করতাম। আমার বান্ধবী বেন্টলীকে ঠাট্টা করত। বেশ ঠান্ডা প্রকৃতির ছিলেন উনি কিন্তু ওর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল বহু বিষয়ে। মাতৃহীন ছিলেন। বেশ কয়েক বছর ধরে যথাসাধ্য করেন অসুস্থ মায়ের জন্য, খুব স্নেহশীলা ছিলেন মা-ও।

আপনি কি ওর বন্ধু?

–ঠিক বন্ধু নয়। টুকিটাকি গল্প করতাম আমরা। এখান থেকে উনি চলে যাবার পর আমি ওঁকে একটা চিঠি লিখি, কিন্তু কোনো উত্তর দেননি তিনি।

–কিন্তু ওকে আপনি পছন্দ করেন তাই না?

হ্যাঁ।

জেমস বেন্টলীর ভীরু চোখ আর রোগা চেহারাটা পোয়ারো মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন।

ওকে সবাই যা মনে করে, তার মধ্যে তিনজন ব্যতিক্রম। মানবচরিত্র বিশ্লেষণে নিখুঁত মিঃ স্পেন্স, পোয়ারো আর এই তরুণীটি।

–আপনার নাম?

–মড উইলিয়ামস। আপনাকে কি আমি সাহায্য করতে পারি।

নিশ্চয়ই। কিছু লোক আছে এখনো যারা মনে করে নির্দোষ বেন্টলী, সেকথা তারাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে। আমি এ ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রসর হতে পেরেছি।

পোয়ারো শেষের মিথ্যে কথাটা অক্লেশে বললেন। তিনি কথা বলাতে চান মডকে দিয়ে।

–আচ্ছা মিস উইলিয়ামস, আপনার সাথে কথাবার্তা বলার সময় কখনো কি বেন্টলী ওর কোনো শত্রুর কথা উল্লেখ করেছিল?

-না, তা কিছু বলেননি তবে তরুণী মেয়েদের নাকি ওর মা খুব একটা পছন্দ করতেন না।

মাতৃভক্ত ছেলেদের মায়েরা কখনোই পছন্দ করেন না তরুণীদের তা জানি আমরা। অন্য কথা আমি ভাবছিলাম। যেমন ধরুন, কারও কথা যার সাথে ওদের বনেনি বা রাগারাগি হয়েছে কারো সঙ্গে এমন কোনো ঘটনা।

-না, সেরকম কোনো শত্রুতার কথা ওঁর মুখে শুনিনি।

–বেন্টলী তার বাড়িউলি মানে মিসেস ম্যাগিনটি সম্পর্কে কিছু বলেছে?

–তেমন কিছু নয়, একটা বেড়াল হারিয়ে একবার মহিলা খুব মুষড়ে পড়েছিলেন, ওর মুখে সে কথা শুনেছিলাম।

–টাকা যে মহিলা লুকিয়ে রাখতেন, সে সম্পর্কে?

–হ্যাঁ বলেছিলেন, উনি খুব অসাধারণ। আমিই যে কোনো সময়ে ওটা নিতে পারি। তবে তেমন কিছু ভেবে নিশ্চয়ই ও কথা বলেননি।

–ভালো কথা আমি এটাই জানতে চাইছিলাম। টাকাটা কেমন ভাবে সহজে হাত করা যায় সে কথাও ও নিশ্চয়ই বলেছিল। এভাবে কিন্তু মনের কথা পাকা খুনীরা ফাস করে না। যাক সে কথা। যদি নির্দোষ হয় বেন্টলী তবে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই খুনী– কে সে?

-আপনি কি কোনো ধারণা করেছেন?

–হ্যাঁ, এই শুরু তদন্তের।

-এবার আমাকে ফিরতে হবে। আমাকে যে কোনো সময় দরকার হলে জানাবেন। যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত।

পোয়ারো তার বর্তমান ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে দিলেন মডকে।

পোয়ারো ফেরার বাস ধরলেন। নির্দোষ বেন্টলী এ কথা ভাবে। এমন একজনকে দলে পেয়ে একটু খুশী তিনি। যখন বেন্টলীর সাথে জেলে দেখা করে ছিলেন, তার সঙ্গে কথা হয়েছিল যা যা, মনে পড়ে গেল সব। ভাবলেন, দুএকজন বন্ধু তাহলে বেন্টলীর ছিল কিন্তু ওকি তা জানে?

বেন্টলী বলেছিল, মিঃ পোয়ারো ধন্যবাদ। তবে আমার মনে হয় না আর এখন আপনারা কিছু ধরতে পারবেন।

-আচ্ছা মিঃ বেন্টলী, কোনো শত্রু ছিল কি আপনার মায়ের?

–মোটেই না। সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করত।

–আর আপনার বন্ধুরা?

–কোনো বন্ধু নেই আমার।

পোয়ারো ভাবলেন, এটা তো মিথ্যে কথা। ওর তো বন্ধুই মড। আত্মবিশ্বাস যে বেন্টলীর চরিত্রে নেই মডের মধ্যে তা বেশ ভালোই আছে।

পোয়ারো ফেললেন দীর্ঘশ্বাস। তবে প্রকৃত খুনী কে? তাকে খুব তাড়াতাড়ি এগোতে হবে। অনেক কাজ বাকি।

.

০৭.

মিসেস ম্যাগিনটির বাড়ি বাস স্টপ থেকে মাত্র কয়েক পা দুটো বাচ্চা খেলা করছিল দরজার ঠিক সামনেই। তাদের একজন বড়সড় একটা রসালো আপেলে কামড় দিচ্ছিল আর প্রাণপণে চিৎকার করতে করতে অন্যজন একটা টিনের ট্রে দিয়ে ঘা দিচ্ছিল দরজায়। কি সুখী দুজনেই।

যেমন কাণ্ড পোয়ারোর এত আওয়াজের মধ্যে আবার নিজেও দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন।

বাড়ির পাশ দিয়ে একজন ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন।

-আর্নি, এ রকম কোরো না। থামো।

–না থামব না।

আবার আর্নি নামের বাচ্চাটা তার নিজের কাজে মন দিল। মানে মানে দরজার সামনে থেকে পোয়ারো সরে গিয়ে উঁকি মারলেন বাড়ির পেছন দিকে।

গলা পাওয়া গেল ভদ্রমহিলার, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায় বাচ্চাদের জ্বালায়, তাই না?

অবশ্য বিরুদ্ধগত মত পোষণ করেন পোয়ারো, তবু ভদ্রমহিলাকে নিজের স্বার্থেই তিনি ঘাটাতে সাহস করলেন না।

–আপনার জন্য আমি ভেতর দিকের দরজাটা খুলে রেখেছি।

তাঁকে সাদর আহ্বান জানালেন মহিলা।

সন্তর্পণে পোয়ারো ভীষণ নোংরা বাসনমাজার জায়গাটা পেরিয়ে ঢুকলেন ততোধিক নোংরা রান্নাঘরে।

-শুনুন মশাই, ভদ্রমহিলা কিন্তু খুন হননি এখানে। ঐ কাণ্ডটা ঘটেছিল বোধ হয় বৈঠকখানায়।

পোয়ারো হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

মশাই এই ব্যাপারে আপনিই তো তদন্ত করছেন, তাই না? আপনি সামারহেসদের বাড়িতে উঠেছেন?

-ও, তাহলে আপনি সব খবরই আমার জানেন, আর তা না জানারই বা কি আছে মিসেস....

–কিডল, একজন রাজমিস্ত্রী আমার স্বামী। প্রায় চার মাস আগে এখানে এসেছি। জানেন, আগে ঐ বাচেঁর মায়ের সঙ্গে থাকতাম।

একজন বললে, আর যাই কর তোমরা খুনের জায়গায় থাকতে যেও না। আরে বাবা খুন হয়েছে তো কি হয়েছে? একটা বাড়ি তো বটে। বলুন আপনি? খুপরী ঘরে কষ্ট করে চেয়ার জোড়া দিয়ে শোবার চেয়ে এ ঢের ভালো।

অবশ্য সবাই বলে–খুন হয় যারা তাদের অতৃপ্ত আত্মাটা নাকি ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এসব দিক দিয়ে এই ভদ্রমহিলার আত্মাটি খুব ভালো। তা, হা দেখবেন নাকি খুনের জায়গাটা?

প্রায় অসহায় পোয়ারো নিজের ভাগ্যের হাতে থুড়ি সমর্পণ করলেন ভদ্রমহিলার হাতে।

একটা ছোট্ট ঘরে মিসেস কিডল তাকে নিয়ে এলেন।

-বুঝলেন, ভদ্রমহিলা এই ঘরের মেঝেতে পড়েছিলেন। মাথার পেছনটা ওর একেবারে দু ফাঁক-ওফ। মিসেস এলিয়টই ওকে ওই অবস্থায় দেখে প্রথমে। লারকিনের সাথে যৌথভাবে রুটির ব্যবসা চালায় মিসেস এলিয়ট। ওপরতলা থেকে কিন্তু চুরি গেছে টাকাটা। আমার সঙ্গে আসুন আপনি, দেখিয়ে দিই সব।

সোজা ওপরে উঠে এলেন মিসেস কিডল। একটা শোবার ঘর-বড় ড্রয়ার, পেতলের একটা খাট, চেয়ার কয়েকটা, একরাশ ভিজে আর শুকনো জামা বাচ্চাদের।

-ঠিক এইখানে, বুঝলেন? চারদিকে পোয়ারো তাকালেন। সত্যিই শক্ত বিশ্বাস করা। ভদ্রমহিলা এখানেই থাকতেন, ঘুমোতেন।

-মিসেস কিডল, নিশ্চয়ই ওঁর আসবাব নয় এগুলো?

-না না, সে সবই ওঁর ভাইঝি কুলাভনে নিয়ে গেছেন।

কোনো স্মৃতিচিহ্নই মিসেস ম্যাগিনটির আর পড়ে নেই। সবকিছু কিডলরা দখল করেছে। জীবন সত্যিই মৃত্যুর পর কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

বাচ্চার তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল নিচের তলা থেকে।

-এঃ হেঃ, উঠে পড়েছে বাচ্চাটা। কিছুটা অনাবশ্যক ভাবেই মহিলাটি কথাটা বলে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে গেলেন। পেছন পেছন পোয়ারো। এখানে তার দেখার মত সত্যিই নেই কিছু, পাশের বাড়ির উদ্দেশ্যে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

–হ্যাঁ মশাই, তাকে আমিই প্রথম মৃত অবস্থায় ওই ভাবে আবিষ্কার করি।

অবাক হতে হয় মিসেস এলিয়টের নাটুকেপনায়। এত ছিমছাম ছোট্টখাট্টো বাড়িতে বেশ বেমানান উনি।

লারকিন, দরজায় রুটিওয়ালা ওই প্রথমে ধাক্কা দেয়। আমাকে বলে যে, মিসেস ম্যাগিনটি কিছুতেই দরজা খুলছেন না। আমার প্রথমেই শুনে মনে হয়েছিল, বয়স হয়েছে। উনি নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়েছেন। বয়েস হলে স্ট্রোকটোক হয়, সে তো জানা কথা। ওর বাড়িতে আমি তাড়াতাড়ি যাই। দুজন পুরুষ মানুষের পক্ষে সোজাসুজি একজন মহিলার ঘরে ঢুকে পড়া একটু অসুবিধেজনক। বোঝেন তো?

ঘাড় নাড়লেন পোয়ারো। তারপর বুঝলেন, আমি সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে যাই। সেই বেন্টলী নামে লোকটা, সে দাঁড়িয়েছিল সিঁড়ির মাথায়। ওকে কি ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। কত না জানি ভয় পেয়েছে। অবশ্য তখন আমি সত্যিই জানি না কি সর্বনাশই না ঘটে গেছে। দরজায় প্রথমে জোরে জোরে ধাক্কা দিলাম। সাড়া পেলাম না। বাধ্য হয়ে হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে দেখি...সব কিছু ঘরের ভেতর লণ্ডভণ্ড তক্তাটা মেঝে থেকে খোলা। চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আমি ডাকাতি বলে। কিন্তু কোথায় গেলেন বৃদ্ধা মহিলা? আমরা ওকে বসার ঘরে গিয়ে দেখতে পাই। ও....ভাবতেও পারি না আমি, একেবারে মাথাটা থেতলে গিয়েছে। খুন। তখুনি আমি বুঝেছিলাম এটা খুন। ডাকাতি আর খুন একসঙ্গে। তারপর সে কি চিৎকার আমার। ওরা দুজন তো আমাকে নিয়ে বেশ ব্যস্তই হয়ে পড়ল। বোধহয় অজ্ঞানই হয়ে গিয়েছিলাম। ব্রাণ্ডি দোকান থেকে এনে খাইয়ে চাঙ্গা করে তোলে আমাকে। কি সমবেদনা পুলিশ সার্জন্টেরও দোহাই আপনার, উত্তেজিত হবেন না, ভয় পাবেন না। গরম চা খান বাড়ি গিয়ে? হ্যানো ত্যানো কত কি। বাড়ি ফিরে আমার স্বামী সব জিজ্ঞেস করলেন, আমার তখনো সেকি কাপুনি। ব্যাপারটা কি জানেন? আসলে আমার মনটা বাচ্চাদের মতই নরম।

পোয়ারো অভদ্রের মত প্রায় দাবড়ানি দিয়েই মহিলাটির আত্মপ্রশংসা করা থামিয়ে দিলেন।

–আচ্ছা আচ্ছা, এখনি বলুন তো ঠিক কখন ওকে আপনি শেষ বারের মত জীবিত অবস্থায় দেখেন?

-সেটা হবে তার আগের দিনই সকালে, উনি বাড়ির পেছনের বাগানে এসেছিলেন পুদিনা শাক তুলতে।

-আপনাকে কি উনি কিছু বলেছিলেন?

-এই টুকটাক আর কি। যেন ভালো যায় সময়টা এ ধরনের শুভকামনা করেছিলেন বলে মনে পড়ছে।

-তাহলে খুন হবার আগের দিন আপনি ওঁকে সকালে শেষবার জীবিত দেখেন তারপর আর নয়।

-হ্যাঁ, তাই তবে ঐ বেন্টলী ছোকরাকে দেখেছিলাম। গলার স্বর মিসেস এলিয়টের খাদে নেমে এল। এই সকাল এগারোটা আন্দাজ। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, এলোমেলো পা ফেলতে ফেলতে যেমন ওর ধরন।

চুপ করে রইলেন পোয়ারো কিন্তু তারপর কিছু বললেন না ভদ্রমহিলা।

হঠাৎ পোয়ারো বললেন, আচ্ছা জবাব দিন তো একটা কথার। সত্যি কি আপনি অবাক হয়েছিলেন যখন পুলিশ বেন্টলীকে গ্রেপ্তার করেছিল?

-হ্যাঁ, হয়েছিলাম আবার হইনিও বলতে পারেন। এটা ঠিক যে আমার বরাবরই ছোকরাকে কেমন খ্যাপাটে ধরনের বলে মনে হত। আমার এক খুড়তুতো ভাইও পাগলাটে। সেও মাঝে মাঝে একটু আধটু উল্টোপাল্টা কাজ করে ফেলে। আমার একেও

সেরকম মনে হয়। ফাঁসিকাঠে একে না ঝুলিয়ে পাগলাগারদে পাঠালেও আশ্চর্য হব না আমি। আরে বাবা, ও চোরাই টাকাগুলো এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখল যে বিশ্বসুদ্ধ লোকে সেটা খুঁজে পাবে। মোট কথা ও বড় বোকা আর সাদাসিধে ধরনের।

–আপনার কি কোনো মাংস কাটার বড় ছুরি বা ওই গোছের কিছু হারিয়েছে?

-না মশাই, অবশ্য এ কথা পুলিশের তরফ থেকেও করা হয়েছিল আমাকে। শুধু আমাকেই নয়, যতজন এখানে আছে সকলকে। আশ্চর্য লাগছে ভাবলে যে ছোকরা কি দিয়ে খুন করলো মহিলাকে।

ডাকঘরের দিকে গুটিগুটি পোয়ারো এগোলেন। কি কাণ্ড খুনী বলে পরিচিত এই বেন্টলী এমন জায়গায় টাকা লুকিয়ে রাখে যাতে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় অথচ খুনের হাতিয়ারটা যে কোথায় লুকালো। মাথা নাড়লেন তিনি। আশেপাশের বাকি বাড়ি দুটোতেও তিনি গিয়েছিলেন যার বাসিন্দারা মিসেস কিডল বা এলিয়েটের মত নয়। তাদের কাছ থেকে মৃতার সম্বন্ধে যা জানা গেছে সংক্ষেপে তা হল :

আত্মসম্মানবোধ সম্পন্না মহিলা ছিলেন উনি। ভালোবাসতেন নিজের মনে থাকতে। ওর এক ভাইঝি থাকে কুলাভনে–সে ছাড়া বিশেষ কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে আসত না। এই নিরীহ মহিলার ওপর কারো রাগ থাকতে পারে মনে হয় না। তবুও অনেকেই সন্দেহ করে বেন্টলীকে খুনী বলে।

মনে মনে পোয়ারো ভাবছিলেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সমাধানের আলো কই? মিঃ স্পেন্সের মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করি আমি। দুদে পুলিশ অফিসার একজন। তিনিও কিছু করতে পারছেন না। কিন্তু এরকুল পোয়ারো আমি–কেন ব্যর্থ হব আমি?

ডাকঘরে ঢুকলেন পোয়ারো, বেশ সাজানো গোছানো অনেকটা জায়গা। এগিয়ে গেলেন। কিছু ডাক টিকিট কেনার উদ্দেশ্য। তার দিকে যে ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন তিনি মধ্যবয়স্কা বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

মিসেস সুইটিম্যান তার নাম।

–নিন। সব মিলিয়ে মোট বারো পেনি। আর কিছু লাগবে?

পোয়ারোর মুখের ওপর নিবদ্ধ মহিলাটির বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি। একটি আগোছাল চুল ভরা মেয়ের মাথা পিছনের দরজা দিয়ে উঁকি মারছিল।

-এ অঞ্চলে একেবারেই নতুন আমি–পোয়ারো বললেন।

–লণ্ডন থেকে বোধহয় এসেছেন?

–আচ্ছা মাদাম, আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা নিশ্চয়ই জানেন আপনি।

–মোটেই উদ্দেশ্য জানি না।

মিসেস ম্যাগিনটি।

–ও, সত্যি মর্মান্তিক।

–বোধহয় আপনি ওকে ভালোভাবেই চিনতেন?

-হ্যাঁ, ব্রডহিনির আর পাঁচজনের মতই আমার পরিচয় ছিল ওর সঙ্গেও। ওর সাথে গল্প হত এখানে এলেই। খুবই দুঃখের ব্যাপার আর যদুর শুনেছি বোধহয় কোনো মীমাংসা হয়নি।

পুলিশের তো সন্দেহ বেন্টলীই খুনী।

–হা জানি। তবে ভুল তো পুলিশেরও হতে পারে। এরকম ঘটনা আকছারই ঘটছে। আবার যেন আপনি ভেবে বসবেন না তার সম্বন্ধে আমি খুব উঁচু ধারণা পোষণ করি। আসলে শুধু সন্দেহের বশে কাউকে খুনী ভাবা উচিত নয় তাই না?

লেখার কাগজ চাইলেন পোয়ারো মহিলাটির কাছে। বাঁদিক থেকে উনি কাগজ আনলেন।

–দেখুন মশাই, এসব অঞ্চলে একেবারেই যে চোর ডাকাতি হয় না তা তো নয়। মনে হয় আমার কোনো ছিঁচকে চোর জানলা খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকেছিল– তারপর সরে পড়েছে টাকাকড়ি হাতিয়ে। নিন আপনার কাগজ।

কেনাকাটা শেষ হল পোয়ারোর।

–আচ্ছা মাদাম, কখনো তো উনি কারো সম্বন্ধে ভয়টয় প্রকাশ করেননি না?

-না তো আমার কাছে তো অন্তত নয়। মিঃ কার্পেন্টারদের বাড়িতে উনি প্রায়ই যেতেন। ওদের ওখানে মাঝে মাঝে পার্টিটার্টি হয় সেই উপলক্ষে কাজে সাহায্য করতে। যা রাত হত ফিরতে বাড়ি তো পাহাড়ের মাথায়। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটা হয়ত ভয় করত।

–আপনি ওর ভাইঝি মিসেস বার্চকে চেনেন?

–হা, আলাপ হয়েছে অল্পস্বল্প। মাঝে মাঝে স্বামীকে নিয়ে আসতেন।

–মহিলার টাকাকড়ি যা কিছু সবই তো পাবেন উনি?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিসেস সুইটিম্যান পোয়ারোর দিকে তাকালেন। স্বাভাবিক নয় কি সেটাই?

-হ্যাঁ, তা তো বটেই তো তো বটেই। আচ্ছা ভাইঝিকে কি মিসেস ম্যাগিনটি পছন্দ করতেন?

-হা খুব ভালোবাসতেন। তবে বড় চাপা স্বভাবের মহিলা ছিলেন উনি।

–আর ভাইঝি জামাইকে?

–যতদূর জানি, তাকেও।

–কবে, ওঁকে আপনি কখন শেষবারের মত জীবিতাবস্থায় দেখেন?

দাঁড়ান মশাই ভেবে দেখি। এডনা মনে আছে তোমার?

অসহায়ের মত দরজার পেছনে দাঁড়ানো এডনা তাকালো।

দাঁড়ান, দাঁড়ান। মৃত্যুর দিন কি? না, তার আগের আগের দিন। সোমাবার ছিল সেদিন আর বুধবার খুন হন উনি। এখানে সোমবার উনি এক বোতল কালি কিনতে এসেছিলেন।

-কালি কিনতে আসেন এক বোতল!

বোধহয় চিঠি লেখার জন্য তা হতে পারে।

-আচ্ছা উনি কি সেদিন কথাবার্তা বেশ স্বাভাবিক বলেছিলেন?

-না, আমার তা মনে হয়নি। এডনা এবার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে যোগ দিল ওদের কথায়। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন মিসেস সুইটিম্যান। সেদিন কিছুটা অস্বাভাবিক ছিল ওঁর আচরণ। মানে বেশ উত্তেজিত ভাব আর কি।

–এডনা ঠিক বলেছে তবে ততটা আমি লক্ষ্য করিনি। আপনি জিজ্ঞেস করাতে খেয়াল হচ্ছে এখন।

–মনে করতে পারেন সেদিন উনি কি বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেন।

–সবটা না পারলেও হয়ত কিছু কিছু পারব। যেমন বেন্টলীর সম্বন্ধে কিছু বলেননি। তবে কার্পেন্টারদের আর মিসেস আপওয়ার্ড সম্বন্ধে কিছু বোধ হয় বলেছিলেন। ওর তো মনিব দুজনেই।

–ও হ্যাঁ, বলুন তো উনি কোথায় কোথায় কাজ করতেন?

–সোম আর বৃহস্পতিবার সামারহেসদের বাড়িতে। আপনি তো ওখানেই আছেন?

–হ্যাঁ, এখানে মনে হয় থাকবার মত আর কোনো জায়গার ব্যবস্থাও নেই?

-না, ঠিক ব্রডহিনিতে কোথাও তেমন ভালো পাবেন না। একটু অসুবিধে হচ্ছে ওখানে আপনার না? অবশ্য মিসেস সামারহেস খুবই ভালো তবে ওঁর ঘর গেরস্থালী সম্পর্কে জ্ঞান বেশ কম। সেরকমই বলতেন মিসেস ম্যাগিনটি। অস্থির হয়ে যেতেন ঘরদোর গুছোতে। মঙ্গলবার সকালে উনি যেতেন ডাঃ রেগুলের ওখানে আর মিসেস আপওয়ার্ডের বাড়ি বিকেলে। মিসেস ওয়েদারবি প্রতি বুধবার ওখানে যেতেন। শুক্রবার ছিল যাবার দিন মিসেস সেলকার্কের কাছে অবশ্য বর্তমানে উনিই মিসেস কার্পেন্টার। মিসেস আপওয়ার্ড বৃদ্ধা-উনি থাকেন ছেলের সাথেই। একটি কাজের মেয়ে আছে ওদের। মিসেস ওয়েদারবি বাতে প্রায় পঙ্গু। কিছুই পারেন না করতে। মিসেস কার্পেন্টার আবার মাত্রাছাড়া শৌখিন। মিসেস ম্যাগিনটিকেই সব ঝক্কি পোহাতে হত।

জানার ছিল না আর কিছু। ডাকঘর থেকে পোয়ারো বেরিয়ে এলেন। চুপচাপ মন্থরগতিতে লংমিডোস-এর সামারহেসেদের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। প্রার্থনা করছিলেন মনে মনে ওই অখাদ্য বীনসেদ্ধ আর টিনের খাবারগুলো যেন সাবাড় হয়ে

গিয়ে থাকে মধ্যাহ্নভোজে। কিন্তু শিকে কি আর ছিঁড়বে বেড়ালের ভাগ্যে? উঃ একবারে যাচ্ছেতাই ওই আস্তানাটা।

পোয়ারো হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলেন আজকের দিনটার কথা। বোধহয় বিফলে গেল। দিনটা যেসব তথ্য জানা গেল, সেগুলোকে মনে মনে সাজালেন :

এক– একজন বান্ধবী ছিল বেন্টলীর।

দুই –তার ও মিসেস ম্যাগিনটির শত্রু ছিল না কোনো।

তিন– মহিলাটিকে মৃত্যুর দিন দুই আগে খুব উত্তেজিত মনে হয়েছিল। এক বোতল কালি কিনেছিলেন তিনি।

বিস্মিত হলে পোয়ারো। কিছুর কি ইঙ্গিত দিচ্ছে কালি কেনার ব্যাপারটা? কোনো চিঠি লেখাটেখা? চিঠি অন্য সকলের ক্ষেত্রে লেখা খুব মামুলী ব্যাপার কিন্তু তা নিঃসন্দেহে ওর পক্ষে মামুলী ছিল না অনভ্যস্ত ছিলেন তিনি নিশ্চয়ই। নইলে কি হঠাৎ কেউ এক বোতল কালি কেনে? উনি যে খুব কম চিঠিপত্র লেখালেখি করতেন তা মিসেস সুইটম্যানের কথা থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু মাত্র মৃত্যুর দুদিন আগে হঠাৎ ওঁর লেখার দরকার হল– হয়ত কোনো চিঠির উত্তর দিতে কাকে কেন : ব্যাপারটা এও হতে পারে তেমন কিছুই নয়। ভাইঝি বা কোনো বন্ধুকে চিঠি দিয়েছিলেন সত্যিই কালি কেনাটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়–কিন্তু এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পোয়ারোর কাছে। এটাকে ভিত্তি করেই এগোতে হবে তাকে....এক বোতল কালি....

.

০৮.

জিজ্ঞেস করছেন চিঠির কথা। বেমি মার্চ মাথা নাড়লেন, না তো, আমি পিসীর কাছ থেকে কোনো চিঠি-পত্তর পাইনি। আর আমাকে হঠাৎ লিখতেই বা যাবেন কেন?

–আপনাকে হয়ত কিছু জানাতে চেয়েছিলেন।

–কিন্তু তিনি মোটেও লেখালিখির ব্যাপারে অভ্যস্ত ছিলেন না। প্রায় বয়স হয়েছিল সত্তরের কাছে। ওদের সময় লেখাপড়ার তেমন চলও ছিল না।

–তবু উনি নিশ্চয়ই লিখতে পড়তে জানতেন।

-হা, হা একজন বিরাট পড়ুয়া ছিলেন না তিনি ঠিকই, তবে নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড আর সানডে কম্প্যানিয়ন নিয়ে ওঁর দিব্যি কেটে যেত সময়। ওঁর কাছে একটু কষ্টকর ছিল লেখালেখির কাজটা। কিন্তু আমাকে জানাবার দরকার হলে যেমন ধরুন কোনো কারণে আমাদের পারস্পরিক দেখা করবার প্রোগ্রামটি বাতিল করতে হলে সাধারণত আমার পাশের বাড়ির কেমিস্ট ভদ্রলোক মিঃ বেনসনকে ফোনে বলে দিতেন। আমি খবরটা পেয়ে যেতাম ওখান থেকেই। মিঃ বেনসন এসব দিক দিয়ে খুব ভদ্র। কখনো কিছু মনে করতেন না। আর ব্রডহিনির ডাকঘর থেকে ফোন করতে পিসীর খরচ হত মাত্র দু পেনি।

পোয়ারো বুঝলেন মিসেস ম্যাগিনটি সত্যি খুব হিসেবী আর মিতব্যয়ী ছিলেন। বেশ সংযত টাকা পয়সার ব্যাপারে।

কথা চালিয়ে গেলেন উনি– কিন্তু আপনাকে তো উনি লিখতেন মাঝে মাঝে।

-হ্যাঁ, বড়দিনে যেমন কার্ড পাঠাতেন।

–হয়ত ইংলণ্ডের অন্যত্র ওর অনেক বন্ধু ছিল- যাদের সাথে চিঠিতে যোগাযোগ রাখতেন।

–আমি সেটা বলতে পারি না। এক ননদ ছিলেন ওঁর–মারা গেছেন দু বছর আগে। আর একজন ছিলেন মিসেস বার্ডলিপ, কিন্তু তিনিও মৃতা।

–ব্যাপারটা তা হলে এমন দাঁড়াচ্ছে যে, তিনি যদি বা কাউকে লিখে থাকেন তা কারোর চিঠির জবাব।

একটু চিন্তিত দেখালো বেমি বার্চকে।

–কিন্তু মিঃ পোয়ারো, ওঁকে কেই বা লিখতে যাবে?

তার মুখটা পরক্ষণেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো–কি আশ্চর্য! সরকার থেকেও তো লিখতে পারে।

পোয়ারো কথাটায় বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না।

মিঃ পোয়ারো বুঝলেন, ফর্ম ভর্তি করা, একগাদা আপত্তিকর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সরকারের চিঠি পেলে অনেক ঝামেলা হয়।

–তাহলে আপনি তাই ভাবছেন মহামান্য সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে উনি কোনো চিঠি পেয়ে তারই জবাব দিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন?

–মনে হয়। তবে যদি তা হত তাহলে পিসী আমাদের কাছে নিশ্চয়ই কাগজপত্র নিয়ে একবার আসতেন। এসব সরকারী ব্যাপারে উনি বরাবর আনাড়ি ছিলেন–বিব্রতও বোধ করতেন।

–আচ্ছা মিসেস বার্চ, আপনার কি মনে আছে ওর ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের মধ্যে চিঠি ছিল কিনা কোনো?

–ঠিক মনে নেই আমার, প্রথমে পুলিশ তদন্ত করে। বেশ কিছুদিন পর আমার হাতে তুলে দেওয়া হয় পিসীমার জিনিসপত্র।

-কি হল জিনিসগুলোর?

–ওই যে চেস্টটা দেখছেন, ওটা ওঁর। খুব ভালো, মেহগনি কাঠের। একটা ওয়ার্ডরোব আছে ওপরে আর ভালো কিছু রান্নার বাসনপত্র, বাকি জিনিসপত্র বিক্রি করে দিয়েছি। এত জায়গার অভাব বাড়িতে।

–ওঁর একান্ত ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের কথা আমি বলছি। এই যেমন–ব্রাশ, চিরুনি ফোটোগ্রাফ, প্রসাধনী, কাপড় জামা....

ওঃ, একটা বাক্সে ওসব জিনিস পুরে আমি রেখেছি ওপরের ঘরে। বড়দিনে জামা কাপড়গুলো গরীবদের মধ্যে ভেবেছি বিলিয়ে দেব। আবার পুরনো জিনিস অনেকে সস্তায় বিক্রি করেন–আমার সেটা পোষাবে না।

–কিছু যদি মনে করেন, একবার খুলে দেখতে পারি এই বাক্সটা?

–নিশ্চয়ই। সেজন্য এত কিন্তু কিন্তু করছেন কেন? অবশ্য আমার মনে হয় না আপনি এমন কিছু তাতে পাবেন যা সাহায্য করবে তদন্তের কাজে। সবই তো পুলিশ দেখেছে। তবু আপনিও দেখুন।

তৎপরতার সাথে মিসেস বার্চ পোয়োরোকে নিয়ে চলে এলেন ছোট্ট একটা শোবার ঘরে। পোয়ারোর মনে হল বাড়ির লোকেদের জামা কাপড় তৈরি করা হয় ঘরটাতে। একটা স্যুটকেস খাটের নিচ থেকে বের করে মিসেস বার্চ বললেন, এই নিন। রান্না চাপিয়ে এসেছি আমি, বড্ড ব্যস্ত। নিজেই আপনি দেখেশুনে নিন।

অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাবে পোয়ারো তাকে বিদায় জানালেন। মিসেস বার্চের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যাবার শব্দ পেলেন। উনি স্যুটকেসের ডালা খুললেন।

ঝুলে ভর্তি ভেতরটা, প্রথমেই বেরোলো ছেঁড়া একটা কোট। সেই মৃতা মহিলার এটি। উলের দুটো সোয়েটার, আরও একখানা কোট, স্কার্ট আর লম্বা মোজা। একটাও পাওয়া গেল

অর্ন্তবাস যখন, ভাইঝিই বোধহয় ব্যবহারের জন্য নিয়েছে। চুলের একটা ব্রাস, একটা চিরুনি ভাঙা কিন্তু পরিষ্কার, একখানা রুপোর গিল্টি করা আয়না। মহিলা আর তার স্বামীর যুগল ফোটো। পিকচার পোস্টকার্ড দুটো, একটা চিনেমাটির কুকুর, পক প্রণালীর ছেঁড়া পাতা উড়ন্ত চাকীর ওপর, খবরের কাগজের একটা কাটিং, একখানা বাইবেল প্রার্থনার বই–এই ধরনের খুঁটিনাটি জিনিস।

পাওয়া গেল না কোনো দস্তানা বা হাতব্যাগ। হয়ত সেগুলোও মিসেস বার্চ নিজে নিয়েছেন বা কাউকে দিয়েছেন। যা জামাকাপড় আছে তা ভাইঝির গায়ে হত না। বেশ ছোটোখাটো মহিলা ছিলেন। বোঝা যাচ্ছে।

একটা জুতোর মোড়ক পেয়ে সেটা পোয়ারো খুললেন। বেশ দামী জুতো অবস্থাও ভালোই রয়েছে জুতোর। তবে পায়ে হত না মিসেস বার্চের। জুতো জোড়া যে কাগজে মোড়া ছিল তা দিয়ে পোয়ারো আবার জুতো মুড়িয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হেড লাইনের দিকে সেটা ওর নজর গেল, সানডে কম্প্যানিয়ন।

উনিশে নভেম্বরের কাগজে। নিহত হন ভদ্রমহিলা ঐ মাসেরই বাইশ তারিখে। তাহলে এই কাগজখানা উনি মারা যাবার দু-তিন দিন আগে কিনেছিলেন। একখানা পড়েছিল ওর ঘরেই পরে নিশ্চয়ই এটি মিসেস বার্চ জুতো মুড়িয়ে রাখেন।

রবিবার উনিশে নভেম্বর, সোমবার বিশ তারিখে মিসেস ম্যাগিনটি ডাকঘরে যান এক বোতল কালি কিনতে। তাহলে কি আকস্মিকভাবেই কোনো কিছুর ওপর নজর পড়েছিল?

অন্য জুতো জোড়ার মোড়ক খুললেন পোয়ারো। সেখানে নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড শিরোনামের কাগজের পাতা। এটার তারিখও উনিশে নভেম্বর।

চোখের সামনে দুখানা কাগজই টান টান করে মেলে ধরতে পোয়ারো আবিষ্কার করলেন, সানডে কম্প্যানিয়নের পৃষ্ঠার কিছুটা অংশ কেটে নেওয়া হয়েছে পরিষ্কার ভাবে। তন্নতন্ন করে, কাগজ দুখানা খুঁজেও কৌতূহলোদ্দীপক কিছু খুঁজে পেলেন না। নিচে গেলেন সুটকেস গুছিয়ে রেখে তখনো মিসেস বার্চ ব্যস্ত রান্নাঘরে।

নিশ্চয়ই আপনি তেমন কিছু খুঁজে পেলেন না?

দায়সারা ভাবে পোয়ারো বললেন, মিসেস বার্চ, আপনার পিসীমার হাত ব্যাগ বা পার্সে কি আপনি কাগজের কোনো কাটিং দেখেছিলেন।

-কই মনে তো পড়ছে না, হয়ত পুলিশ নিয়ে গেছে।

কিন্তু না, স্পেন্সের দেওয়া কাগজপত্র পোয়ারো ঘেঁটে বুঝলেন সেরকম কিছু পায়নি পুলিশ। তারা বাজেয়াপ্ত করেছে হাতব্যাগ কিন্তু কাগজের কোনো কাটিং ছিল না তাতে।

-হুম, দুটো জিনিস হতে পারে। হয় কিছুই নয় ঘটনাটা, অথবা আমার নতুন পদক্ষেপের সূচনা।

পুরনো খবরের কাগজের ফাইলের সামনে নিথর হয়ে বসে থাকা পোয়ারো ভাবলেন মিসেস ম্যাগনটির কালি কেনার ব্যাপারটা তার মনে যে ধাঁধাঁ লাগিয়েছিল তা নিছক অর্থহীন নয়। সানডে কম্প্যানিয়ন পুরনো দিনের ঘটনার চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রকাশ করার জন্য বিখ্যাত। উনিশে নভেম্বরের সানডে কম্প্যানিয়নের পাতা খোলা পোয়ারোর সামনে। মাঝের পাতার একেবারে ওপর দিকে বড়বড় হরফে লেখা :

বিগত দিনের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জড়িত এই মহিলারা এখন কোথায়?

এর ঠিক নিচে চারটে পুরনো ঝাপসা ছবি যা দেখেই বোঝা সম্ভব নয়। তবে পুরনো দিনের পোশাকে সজ্জিতা মহিলাদের ছবি তো। তাই অদ্ভুত লাগছিলো। একটি করে নাম ছাপা প্রত্যেক ছবির নিচে।

ইভা কেন-কুখ্যাত গ্রেস মামলার অপর মহিলাটি। জেনিস কোর্টল্যাণ্ড–সেই দুভাগ মহিলা যার স্বামীর নৃশংসতা ছিল নজিরবিহীন।

-ছোট লিলি গ্যাম্বল-সামাজিক বিধিনিষেধের শিকার এই শিশুটি।

ভেরা ব্লেক–কখনো ভদ্রমহিলাটি সন্দেহ করেননি যে একজন হত্যাকারী তার স্বামী। এখন এঁরা কোথায়।

এবার পোয়ারো মনঃসংযোগ করলেন ছবির নিচে দেওয়া এদের জীবনের সংক্ষিপ্ত রোমহর্ষক বিবরণে।

তার মনে পড়ল ইভা কেনের নাম। সেই সময়ের অন্যতম চাঞ্চল্যকর মামলা ছিল সেটা। একটা ছোট শহরে যার নাম পারমিনস্টার তাতে আলফ্রেড ক্রেগ কেরানীর কাজ করত। সাদামাটা চেহারার ভদ্র মার্জিত লোক ছিল সে। কিন্তু তার স্ত্রী দুর্ভাগ্যবশত ছিল রুক্ষ বদমেজাজী স্বভাবের। এক মুহূর্তের জন্যও ক্রেগকে স্বস্তি দিত না। স্ত্রীর দৌলতে ডুবে গেল ক্রেগ, নিজেকে অসুস্থ বলে জাহির করত কিন্তু লোকে বলত সবই মনগড়া অসুখবিসুখ। ইভা কেন এদের বাড়িতে গভর্নেসের কাজ করত। এই উনিশ বছরের ইভা মিষ্টি চেহারার নরম প্রকৃতির অসহায় একটি মেয়ে। আলফ্রেড এবং ইভা দিনে দিনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং গভীরভাবে দুজন দুজনকে ভালোবাসে।

একদিন প্রতিবেশীরা শোনে যে, মিসেস ক্রেগকে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বাইরে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন ডাক্তার। সবাইকে ক্রেগ সেইরকমই বলেছিল। সে স্ত্রীকে লন্ডনে পৌঁছে দিয়ে আসে গাড়ি করে এবং সেখান থেকে মিসেস ক্রেগ নাকি যাত্রা করেন ফ্রান্সের দক্ষিণে। ক্রেগ পারমিনস্টারে ফিরে আসে। সে প্রতিবেশীদের প্রায়ই কথা প্রসঙ্গে জানাত যে, স্ত্রী চিঠিতে লিখেছে তার শরীর ভালো যাচ্ছে না বলে। ঘরের কাজকর্ম দেখাশুনো করতে ইভা রয়ে যায় ক্রেগের বাড়িতেই। দুজনের ঘনিষ্ঠতাকে কেন্দ্র করে মৃত্যু সংবাদ পায় তার স্ত্রীর। খবর পেয়ে এক সপ্তাহ ছুটি নিয়ে সে চলে যায় এবং স্ত্রীর শেষ কাজ করে ফিরে আসে।

একটা মস্ত ভুল করে কিন্তু ক্রেগ। যে জায়গায় তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে সে বলেছিল, সেটা খুবই পরিচিত অঞ্চল। ফ্রান্সের এক জন প্রতিবেশী ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা তার এক আত্মীয়কে লেখা চিঠিতে মিসেস ক্রেগের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছিল। কিন্তু চিঠির উত্তর মারফত সে জানতে পারে এরকম কোনো মৃত্যু ঘটেনি সেখানে। এর কয়েকদিন বাদে

পুলিশি তদন্ত হয়। সকলেই জানে তার পরের ঘটনা। আদৌ মিসেস ক্রেগ ফ্রান্সে যায়নি। ময়নাতদন্তে জানা যায় ভেষজ বিশে তাকে হত্যা করে খণ্ড খণ্ড করে পরিষ্কার ভাবে কেটে ফেলে ক্রেগের বাড়ির চিলেকোঠায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। হত্যাপরাধে ক্রেগ অভিযুক্ত হয়। ইভা কেনও ধরা পড়ে কিন্তু প্রমাণাভাবে ছাড়া পায়। কারণ এ সবের কিছুই সে জানত না। নিজের অপরাধ ক্রেগ স্বীকার করে শাস্তি পায়। ইভা সেই সময় সন্তানসম্ভবা ছিল সে পারমিনস্টার ছেড়ে চলে যায়। কোনো সহৃদয় আত্মীয় তাকে আশ্রয় দেন। নিজের নাম ইভা পরিবর্তন করে নৃশংস হত্যাকারী ক্রেগের আওতা মুক্ত হয়ে জীবন শুরু করে নতুন ভাবে। নিজের আত্মজার কাছেও এই ঘটনা সে এবং তার জন্মদাতার নাম গোপন রাখে। সে বলে, আমার মেয়ে সুন্দর সুস্থ জীবনযাপন করুক তা চাই আমি আমার অতীতের ছায়া যেন না পড়ে তার জীবনে। আমার কলঙ্ক, দুঃখ সে আমারই থাক, যেন এতে তার কোনো ক্ষতি না হয়।

বেচারা ইভা। কত অল্প বয়সে তার নিজের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। এখন সে কোথায়? হয়ত কোনো ছোট্ট শহরে, একজন বৃদ্ধা শ্রদ্ধেয়া মহিলা হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত হয়ে শান্ত নিরুপদ্রব জীবন কাটাচ্ছে। হয়ত বা তার মেয়ে স্বামী সন্তান নিয়ে সুখী হয়েছে, নিজের জীবনের খুঁটিনাটি সুখদুঃখের কথা মাকে জানায় সে, কিন্তু কোনোদিন নিজে জানতে পারে না তার মা কত দুঃখী।

-হুম।

পরের ছবিতে পোয়ারো নজর দিলেন।

জেনিস কোর্টল্যাণ্ডের এই ছবি, সত্যিই ভদ্রমহিলা দুর্ভাগ্যের শিকার। অত্যন্ত মন্দ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ওর স্বামী। মহিলাটি দীর্ঘ সত্যিই আট বছর নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। তারপর ওর সঙ্গে এক ভদ্র যুবকের বন্ধুত্ব হয়। ভদ্র ও আদর্শবাদী এই যুবকটি জেনিসের ওপর একদিন তার স্বামীর অকথ্য অত্যাচার দেখে রেগে ওঠে এত যে, তার অত্যন্ত করুণ পরিণতি হয়। মার্বেল পাথরের ফায়ার প্লেসে সে জেনিসের স্বামীর মাথা ঠুকে ঠুকে ফাটিয়ে দেয়। ফলে পাঁচ বছরের জেল হয় তার। অসহায় জেনিস সব কিছু ভুলে থাকার জন্য বিদেশ চলে যায়।

কিন্তু সত্যিই সে কি সব ভুলে গেছে? সেইটুকু আশা করি আমরা স্বামী সংসার পরিবৃতা হয়ে, হয়ত নিজের দুঃখ মনে চেপে রেখে আপাত দৃষ্টিতে সে সুখী জীবন যাপন করছে। লিলি গ্যাম্বলের ছবিটি হল তৃতীয় ছবি।

যে পরিবারের সন্তান লিলি তাতে পরিবারের লোক সংখ্যা অনুপাতে আয়ের অংক অত্যন্ত কম হওয়ায় ওর এক পিসী নিজের কাছে ওকে নিয়ে আসেন। সিনেমা যেতে চাইলে লিলিকে তিনি বাধা দিতেন। এরকম প্রায়ই বাধা পাওয়াতে লিলি ক্ষিপ্ত হয়ে একদিন মাংস কাটার ছুরি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে মহিলাকে। এই আঘাতে রোগা এবং ছোটখাটো চেহারার পিসীটি মারা যান। তখন লিলির বছর বারো বয়েস, অল্প বয়েসী কয়েদীদের স্কুলে স্থান পায় লিলি ও লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়।

এখন নিশ্চয়ই একজন মহিলা লিলি আবার তার পুরনো জীবন সে ফিরে পেতে পারে। তার আচরণ খুব সন্তোষজনক ছিল। সে যতটা অপরাধের জন্য নিজে দায়ী, তার চেয়ে সমাজের বিধি নিষেধও কিছু কমদামী নয়। লিলি সমাজের নানারকম নিয়মের শিকার

হয়েছিল। সে হয়ত আজ কারো সুখী স্ত্রী; কোনো সন্তানের সুখী মা। হায় ছোট্ট লিলি গ্যাম্বল।

পোয়ারো মাথা নাড়লেন। বারো বছরের লিলি, যে নাকি পিসীকে আঘাত করে মাংস কাটার ছুরি দিয়ে সে কখনোই খুব ভালো হতে পারে না। পোয়ারো কিন্তু এক্ষেত্রে হতভাগ্য পিসীর পক্ষই অবলম্বন করবেন।

ভেরা ব্লেকের শেষ ছবিখানা :

এমন এক শ্রেণীর মহিলা হল ভেরা–চিরদিনই যাদের ভাগ্য খারাপ। যে ছেলেটির সঙ্গে প্রথমে তার বন্ধুত্ব ছিল, জানতে পারা যায় ব্যাঙ্কের দারোয়ানকে খতম করে ডাকাতি করায় সে নজরবন্দী পুলিশের। পরবর্তীকালে ভেরা বিয়ে করে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীকে। চোরাই মালের ব্যবাসা ছিল নাকি তার আবার। পুলিশের নেকনজর থেকে রেহাই পায়নি ভেরার দুই সন্তানও মায়ের সঙ্গে তারা মনিহারি দোকানে গেলে এটা সেটা দোকানের জিনিস সরাত। ভেরার অভিশপ্ত জীবন শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায়। এক সহৃদয় ভদ্রলোক আশ্রয় দেন ভেরাকে তার দুটি সন্তানসহ। পর পর ভাগ্যের হাতে মার খাবার পর সুদিন এসেছে ভেরার।

আপন মনে পোয়ারো বললেন, এতেও সন্দেহ আছে আমার। কে বলতে পারে হয়ত ভেরা কোনো এক ধাপ্পাবাজের খপ্পরে পড়েছে এবার।

ভালো করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পোয়ারো ছবি চারটি দেখতে লাগলেন।

ইভা কেনের মাথায় কোকড়া কোঁকড়া চুল–নেমে এসেছে কানের দুপাশ দিয়ে। মস্ত টুপি মাথায়। টেলিফোনের রিসিভার কানে দেবার মত করে এ হাতে ধরা একগুচ্ছ গোলাপ কানের পাশে।

কান ঢাকা টুপি জেনিস কোর্টল্যাণ্ডের মাথায়। কোমরে কোমর বন্ধনী।

খুব সাধাসিধে চেহারার লিলি গ্যাম্বল। হাঁ করে আছে, চোখে মোটা কাঁচের চশমা। এতই অস্পষ্ট ভেরা ব্লেকের ছবি যে প্রায় কিছু বোঝাই যায় না।

মিসেস ম্যাগিনটি কোনো কারণে এগুলো কাগজ থেকে কেটে রেখেছিলেন, বোঝা গেল। এই খবরগুলোর অংশ জুতার মোড়কের কাগজটাতে তাই পাওয়া যায়নি। কিন্তু কেন? সে কি, কারণ? এসব কি ওর শুধুই কৌতূহল উদ্রেক করেছিল?

আদপেই তা মনে হয় না পোয়ারোর। এই ষাট বছরের মহিলা জীবনে খুব কম জিনিসই ব্যক্তিগত সংগ্রহে রেখেছেন। পুলিশের রেকর্ড দেখেই তা বোঝা যায়। কাগজ থেকে রবিবার ভদ্র মহিলা কেটে রাখেন এগুলো। ডাকঘরে সোমবার যান এক বোতল কালি কিনতে সুতরাং অনুমান করা কঠিন নয় যে উনি, যাঁর চিঠি লেখার অভ্যেস ছিল না, লিখতে যাচ্ছিলেন একটা চিঠি। যদি আইন সংক্রান্ত চিঠি হত এটা তাহলে উনি সাহায্য নিতেন মিঃ বার্চের। সুতরাং তা যখন নেননি, সে সম্ভাবনা নেই- তাহলে?

আবার ছবি চারটের দিকে পোয়ারো তাকালেন। এখন এরা কোথায়? একটা কথা তিনি ভাবলেন–কে বলতে পারে এদের যে কেউ হয়ত একজন গত নভেম্বরে এই ব্রডহিনিতেই ছিলেন।

অবশ্য পোয়ারো পরের দিনের আগে মিস পামেলা হসফলের সংগে যোগাযোগ করে উঠতে পারলেন না। মিস হসফল কিন্তু বলে রেখেছিলেন তিনি খুব বেশি সময় দিতে পারবেন না, কারণ তাঁকে শেফিল্ড যেতে হচ্ছে বিশেষ কাজে।

দীর্ঘকায় পামেলা চেহারায় পুরুষালি ধাচের, পানাসক্ত এবং ধূমপানে অভ্যস্ত। তাকে দেখে বোঝা বেশ শক্ত যে কাগজের এরকম সেন্টিমেন্টাল লেখাটির লেখিকা তিনি।

-মঁসিয়ে পোয়ারো যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন। আমার আবার বড্ড তাড়া আছে।

-ও হ্যাঁ, আপনারই একটা লেখার ব্যাপারে কথাটা সানডে কম্প্যানিয়নে ....গত নভেম্বরে.... নৃশংস ঘটনার শিকার চারজন হতভাগ্য মহিলার ব্যাপারে....

-হা হা। ঘটনাটা বেশ রসালো কি বলেন?

–অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনাগুলোর কথাই আমি বিশেষভাবে বলতে চাইছি। গত উনিশে নভেম্বরের প্রবন্ধটা। চারজন মহিলা হলেন ইভা কেন, ভেরা ব্লেক, জেনিস কোর্টল্যাণ্ড আর লিলি গ্যাম্বল।

মুচকি হাসলেন পামেলা-হা, হা এখন কোথায় এই সব মহিলারা?...মনে পড়েছে।

–মনে হয় আমার নিশ্চয়ই আপনি এসব ব্যাপারে মাঝে মাঝে উদ্ভট উদ্ভট চিঠিপত্র পেয়ে থাকেন।

–ওহ নিশ্চয়ই। কারো কারোর তো আজগুবি চিঠি লেখা ছাড়া কাজ থাকে না কোনো। যেমন ধরুন, কেউ নাকি খুনী ক্রেগকে হেঁটে যেতে দেখেছে রাস্তা দিয়ে। আবার কেউ কেউ নিজের জীবনের আরও করুণ আর আষাঢ়ে গল্প ফাঁদে।

কাগজে এই ফিচারটা ছাপা হবার পর ব্রডহিনি থেকে কোনো এক মিসেস ম্যাগিনটির লেখা একটা চিঠি কি পেয়েছিলেন আপনি।

ওঃ হো মঁসিয়ে পোয়ারো, তা কেমন করে জানব বলুন? আমি দিস্তে দিস্তে রোজ চিঠি পাই। অত চিঠির মধ্যে থেকে একটা বিশেষ কোনো নাম কেমন করে আমার মনে থাকতে পারে আপনি বলুন।

–তা ঠিক। তবুও মনে হয় আমার মনে রাখা উচিত ছিল আপনার; কারণ তার কয়েকদিন পরেই খুন হন উনি।

–আপনি এতক্ষণে ঝেড়ে কাসছেন মঁসিয়ে। ম্যাগিনটি, ম্যাগিনটি.... যেন চেনা চেনা লাগছে নামটা...। হ্যাঁ, মনে পড়েছে এইবার। মাথায় বাড়ি মেরে ওর বাড়ির ভাড়াটে ওকে খুন করেছিল, ঠিক কিনা, অবশ্য উত্তেজক খুন ওটা ছিল না। আপনি বলছেন ঐ ভদ্রমহিলা আমায় কোনো চিঠি লিখেছিলেন?

না, আপনাকে ঠিক কিনা জানি না। তবে সানডে কম্প্যানিয়ন এর চিঠিপত্র বিভাগে হয়ত...।

একই ব্যাপার আমার কাছেই আসত সে চিঠি। খুন হলেন ভদ্রমহিলা–তিনিই চিঠি লিখেছিলেন–তাহলে তো আমার মনে রাখার কথা। দাঁড়ান, দাঁড়ান-ব্রডহিনি থেকে ওটা নয়, ব্রডওয়ে থেকে লেখা।

-তাহলে মনে পড়েছে?

-না, খুব সঠিকভাবে কিছু মনে পড়ছে না... তবে ম্যাগিনটি...এ সবই এত মজার মনে হয় শুনতে মনে হচ্ছে যেন অন্যরকম পদবী। খুব বিশ্রী জড়িয়ে জড়িয়ে লেখা। সম্ভবত ভদ্রমহিলা তেমন শিক্ষিতা নন। তবে আমি নিশ্চিত যে ব্রডওয়ে থেকেই ওটা এসেছিল।

কিন্তু নিজেই তো আপনি বললেন জড়ানো লেখাটা। ব্রডহিনি, ব্রডওয়ে বানানের সামান্য এধার ওধার তো, আপনি ঠিকমত হয়ত পড়তে পারেননি।

–হ্যাঁ, তাও হতে পারে। ছোটোখাটো মফস্বলের জায়গার নাম তো ভুলও হতে পারে। ম্যাগিনটি হা হা, আমি এবার নিশ্চিত। খুনটা হয়েছিল বলেই স্পষ্ট মনে পড়ছে নামটা।

–আচ্ছা উনি কি লিখেছিলেন চিঠিতে মনে আছে আপনার? –কোনো একটা ছবির ব্যাপারে কিছু। সম্ভবত কাগজের ছবির মত উনি কোনো একটা ফটোগ্রাফ কোথাও দেখেছিলেন। তাই জানতে চেয়েছিলেন সেটার জন্য আমরা ওকে কত টাকা দিতে পারি।

এবং উত্তর দিয়েছিলেন আপনি?

-দেখুন, আমাদের এ ধরনের কোনো ফটোর প্রয়োজন ছিল না। চিরাচরিত প্রথায় ধন্যবাদ জানিয়ে ওর প্রস্তাব গ্রহণে অসমর্থ আমরা –একথা লিখে জানিয়ে দিয়েছিলাম ওঁকে। কিন্তু ব্রডওয়েের ঠিকানায় তো যে উত্তর লেখা হয়েছিল, যা বুঝতে পারছি এখন। হয়ত কোনোদিনই উনি সে উত্তর পেতেন না।

-উনি জানতেন কোথাও ওরকম ছবি আছে একটা ....মনে পড়ল পোয়ারোর মরিন সামারহেসের কথা। মরিন বলেছিল, একটু ছোঁক ছোঁক করার অভ্যেস ছিল মিসেস ম্যাগিনটির। সৎ ছিলেন ভদ্র মহিলা কিন্তু একটু যেন বেশি কৌতূহল ওঁর। অতীতের স্মৃতি বিজড়িত আজেবাজে তুচ্ছ জিনিষ মানুষ অনেকেই রেখে দেয়? হয় নিছক সেন্টিমেন্টের দায়ে নয় কিছু না ভেবেই পুরনো বিবর্ণ এরকম একটা ছবি কারও বাড়িতে উনি দেখেছিলেন, সেটা পরে কাগজের কোনো একটা ছবির সাথে এক বলে সনাক্ত করে। এমন কথাও উনি ভেবেছিলেন এ থেকে কিছু টাকা পয়সা যদি পাওয়া যায় মন্দ কি?

উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো, মিস হর্সফল ধন্যবাদ! ক্ষমা করবেন আমাকে কিন্তু যা যা আপনি লিখেছিলেন তা কি সবই সঠিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে? যেমন ধরুন, আমি জানি যে ক্রেগ মামলার সালটা ভুল উল্লেখ করা হয়েছে। ওটা এক বছর পরের মামলা ছিল। জেনিসের স্বামীর নাম হার বার্চের বাদলে হু বার্চ ছাপা হয়েছে। বার্কিংহামসায়ারের বাসিন্দা ছিলেন লিলির পিসী, বার্কশায়ারের নন।

সিগারেট সমেত হাতটা পামেলা অসহিষ্ণুভাবে নাড়লেন।

–দেখুন মঁসিয়ে, বিশেষ কিছু এসে যায় না সঠিক তথ্যে। রোমান্টিক সেন্টিমেন্টে ভরা লেখার সবটাই। মোটামুটি ঘটনাটুকু ঠিক রেখে পাঠকদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেছি মাত্র।

–না, মানে বলতে চাইছি যেভাবে ঐ মহিলাদের চরিত্রগুলো আপনি বর্ণনা করেছেন, আদপেই হয়তো তা নয়।

আবার অধৈর্য হয়ে পামেলা গলার কর্কশ আওয়াজ চুললেন, নিশ্চয়ই, আমি আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। আমার তো সন্দেহ নেই যে, ইভা কেন কুকুরীরও অধম এবং সে একটুও সরল ছিল না। কি মতলবেই বা জেসি নামের মহিলাটি আট-আটটা বছর স্বামীর অত্যাচার সহ্য করল চুপচাপ; স্বামীর অঢেল অর্থ নিশ্চয়ই ছিল আর তার পুরুষ বন্ধুটি ছিল কপর্দকহীন।

–আর লিলি?

–অবশ্য আমি ওকে আমার চারদিকে ছুরি নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেও গ্রাহ্য করব না। নিজের হাতের আঙুল নাড়াচাড়া করছিলেন পোয়ারো।

দেখুন মিস হর্সফল, এমন হতে পারে যে সবাই ওরা অন্য দেশে চলে গেছে, নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদের কেউই এদেশে আবার ফিরে আসেনি।

-না, সে তো হতেই পারে। আমায় এবার ছুটি দিন মঁসিয়ে উঠতেই হচ্ছে আমাকে।

পোয়ারো সুপারিন্টেন্টে মিঃ স্পেন্সকে বেশ রাতে ফোন করলেন।

–মিঃ পোয়ারো আপনার কথাই আমি ভাবছিলাম কোনো তথ্য পেলেন? যা হোক কিছু? নতুন?

-তদন্ত করেছি আমি,-গম্ভীর পোয়ারোর গলা শোনা গেল।

–এবং?

–একটিই তার ফল, সকলেই ব্রডহিনির বাসিন্দারা খুব চমৎকার লোক।

–মঁসিয়ে কি বোঝাতে চাইছেন আপনি?

বন্ধু আমার, চিন্তা করুন কথাটা খুব চমৎকার লোক–তাই-ই তো তারা.... খুনের উদ্দেশ্যটা যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে।

.

০৯.

পোয়ারো স্টেশনের কাছে ক্রমওয়েল গেট পেরোতে পেরোতে আপন মনে মন্তব্য করলেন, খুব ভালো লোক সবাই।

একটা পেতলের ফলক দরজাটার সামনে জানান দিচ্ছিল যে, এখানেই ডাঃ রেগুল থাকেন।

–চল্লিশোত্তীর্ণ ডাঃ রেগুল লম্বা-চওড়া হাসিখুশী মানুষ। তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানালেন অতিথি পোয়ারোকে।

-ধন্য হয়েছে আমাদের গ্রাম আপনার আগমনে, মঁসিয়ে পোয়ারা।

আত্মতুষ্টিতে ভরপুর পোয়ারো। তাহলে আপনিও আমার নাম শুনেছেন?

–নিশ্চয়ই শুনেছি। কে না জানে বলুন আপনার কথা। এবার পোয়ারো সংযত হলেন। ডাঃ রেগুল; আমার সৌভাগ্য যে আপনাকে বাড়িতেই পেয়েছি।

বাড়িতেই ডাক্তারকে পাওয়ার সঙ্গে সৌভাগ্যের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। উনি এ সময় বাড়িতেই থাকেন। খুশীমনে উনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ঠিক সময়েই আপনি এসেছেন। অবশ্য আমাকে মিনিট পনেরোর মধ্যেই বেরোতে হবে। বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি? মশাই আমি তো কৌতূহলে মরে যাচ্ছি যে, এখানে আপনার মত লোক কেন? নিছক বিশ্রামের জন্য না খুনটুনের ব্যাপার।

–অতীতের অপরাধ।

–অতীতের? কিছুই তো আমার মাথায় ঢুকছে না।

মিসেস ম্যাগিনটি।

–ও হা হা। ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। তা এতদিন বাদে মাথা ঘামাচ্ছেন আপনারা। ব্যাপার কি বলুন দেখি?

তা হলে শুনুন, আমি এসেছি পুলিশের তরফ থেকে, পূর্ণতদন্তের জন্য।

তীক্ষ্নস্বরে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু নতুন তথ্যই বা কি থাকতে পারে?

–আপনাকে সেটা এখুনি জানাবার অধিকার নেই রেগুল।

–ও, মাপ করবেন আমায়।

–আপনাকে অবশ্যই এটুকু বলতে বাধা নেই যে এমন অনেক তথ্যের সন্ধান আমি পেয়েছি যা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ রেগুল, আপনার কাছে এসেছি কারণ আমি শুনেছি যে মিসেস ম্যাগিনটি টুকিটাকি কাজের জন্য আপনার এখানে মাঝে মাঝে আসতেন।

দুজনের জন্য ডঃ রেগুল দু গ্লাস শেরী নিয়ে এলেন।

সপ্তাহে একদিন করে উনি আমার এখানে আসতেন। ঘরের কাজ করার জন্য আমাদের অন্য যে মেয়েটি আছে সে বেশ ভালো কিন্তু পেতলের জিনিস, রান্নাঘরের মেঝে ইত্যাদি পরিষ্কার করার জন্য আমরা নিয়োগ করেছিলাম মিসেস ম্যাগিনটিকে।

–আচ্ছা কি মনে হয় আপনার ভদ্রমহিলা সত্যি কথা বলতেন?

-সেটাও ঠিক বলতে পারব না। ওকে সেরকম ভাবে জানবার সুযোগ কখনো হয়নি আমার। তবে যতদূর মনে হয় সত্যি কথাই উনি বলতেন।

তার মানে যদি উনি কারো কাছে কোনো বিষয়ে মন্তব্য করেন তবে তা সত্যি হতেও পারে, কেমন?

একটু বিব্রত দেখালো ডাক্তারকে।

–অতটা তো ঠিক আমি বলতে পারব না। অনুমতি যদি করেন বরং আমি আমাদের কাজের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি।

-না না, কোনো দরকার নেই তার।

–আপনি তো মশাই আমার কৌতূহল বাড়িয়েই তুলছেন, কি বলেছিলেন ভদ্রমহিলা বলুন তো? নিশ্চয়ই আজেবাজে কথা?

মাথা নাড়লেন পোয়ারো, দুঃখিত ডাক্তার। কিছু বলার হুকুম নেই আমার ওপর। অত্যন্ত গোপনীয় সব ব্যাপারটাই আর সবে তদন্ত শুরু করেছি আমিও।

ডঃ রেগুল শুকনো গলায় বললেন, তাড়াতাড়ি তো আপনাকে তদন্ত করতে হবে।

–ঠিক বলেছেন, বিশেষ সময় নেই হাতে।

–একথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে, আমায় অবাক করেছেন আপনি। এখানকার সকলে তো আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে এ কাজ বেন্টলীই করেছে। এতে কোনো সন্দেহ আছে বলে তো শুনিনি?

–আপনাদের সকলের মতে এটা একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র?

–সে রকমই তো ভেবেছিলাম।

–আপনি জেমস বেন্টলীকে চেনেন?

ছোটোখাটো অসুখের ব্যাপারে আমার কাছে কখনো কখনো এসেছে। ও খুব ভীতু ছিল স্বাস্থ্যের ব্যাপারে। ওর মা ওকে অতিরিক্ত আহ্লাদ দিয়েছেন আর কি। এখানে আরও এরকম নজীর আছে একটি।

-কি রকম?

মিসেস লরা আপওয়ার্ড। ওঃ কি আহ্লদই না দেন ছেলেকে। বুদ্ধিমান ছেলেটি, কিছুটা প্রতিভাবানও বটে। উঠতি নাট্যকারদের মধ্যে একজন ওই রবিন আপওয়ার্ড।

–এখানে কি ওরা অনেকদিন আছেন?

–তিন-চার বছর হবে। এ অঞ্চলে কেউই আমরা খুব বেশি দিন আসিনি। বরং লং মিডোস-এর চারদিকে কয়েকটা মাত্র বাড়িতে পুরনো কয়েক ঘর বাসিন্দা আছেন। ওখানেই তো আপনি আছেন?

-হ্যাঁ।

কৌতুক প্রিয় ডঃ রেগুল হেসে বললেন, অতিথিশালা। কিন্তু যা তড়বড়ে স্বভাবের মহিলাটি। আসলে বিবাহিত জীবনে বেশিরভাগ সময়টাই ভারতবর্ষ কাটান ওরা–দাসদাসী পরিবৃত হয়ে আমি তো মশাই বাজি ফেলে বলতে পারি আপনার বেশ অসুবিধেই হচ্ছে ওখানে। ওখানে বেশিদিন থাকতে পারে না কেউ। মেজর সামারহেস লোক ভালো কিন্তু তেমন বোঝেন না ব্যবসাপত্র, আজকাল সেটা খুব দরকার। ওদের দুজনকেই অবশ্যই আমি যথেষ্ট পছন্দ করি। খুব রাশভারী মেজাজের মানুষ ছিলেন মেজরের বাবা। মারা যাবার সময়ে বিশেষ টাকাকড়ি রেখে যেতে পারেননি। তবে নানা অসুবিধে সত্ত্বেও এখানেই শেষ পর্যন্ত সামারহেসরা রয়ে গেলেন।

ঘড়ির দিকে তাকালেন ডাক্তার। পোয়ারো বললেন, আপনার সময় আমি আর নষ্ট করব না।

-না না, আর কিছুক্ষণ আমি থাকতে পারি। আমার স্ত্রীর সাথে আলাপ করলে খুশী হবেন আপনি। ওর খুব কৌতূহল আছে আপনার সম্বন্ধে। মানে, কেন এখানে এসেছে আপনার মত মানুষ। দুজনেই আমরা গোয়েন্দা কাহিনীর দারুণ ভক্ত।

–অপরাধ বিজ্ঞান, রহস্য কাহিনী না কি রবিবারের পত্রিকাগুলো পড়েন?

–তিনটেই।

–সানডে কম্প্যানিয়ন-এর মত বাজে পত্রিকাও?

–তা কেনই বা বাদ যায় ওটা?

–ওরা একটা বিবরণ মাস পাঁচেক আগে ছাপিয়েছিল অতীতের অপরাধ জগতের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে।

-হা হা, মনে পড়েছে। তবে খুব অস্পষ্ট বিবরণ পুরোটাই।

–তাই মনে হয় আপনার? অবশ্য ক্রেগ মামলার বিষয়টা কাগজ পড়েই জানতে পারি প্রথম। কিন্তু কোর্টল্যাণ্ডের ব্যাপারটা হলফ করে আপনাকে বলতে পারি মোটেই সরল ছিলেন ভদ্র মহিলা। আমি ঘটনাটার কিছুটা জানি কারণ আমার এক কাকার সঙ্গে কোনো ব্যাপারে ওই ভদ্রলোকের যোগাযোগ ছিল। তেমন সুপুরুষ ছিলেন না ভদ্রলোক। ওঁর স্ত্রীও তথৈবচ। স্ত্রীই তরুণটিকে প্ররোচিত করেন স্বামীকে খুন করার জন্য। তারপর হাজতে যায় তরুণটি আর ভদ্রমহিলা, পরে আবার ঐ ধনী বিধবা অন্যত্র বিয়ে করেন।

এত খবর তো সানডে কম্প্যানিয়ন কিছুই দেয়নি। একটু মনে করে আপনি বলতে পারেন পরে কাকে উনি বিয়ে করেন?

-নাঃ কখনো সেটা শুনেছি বলে মনেও পড়ে না। কিন্তু এটুকু শুনেছিলাম যে, লোক ভালোই ছিলেন তিনি।

অবাক হয়ে সকলে ভাবছে এই চারজন মহিলা কোথায় আছেন এখন।

-বুঝতে পারছি। হয়ত কোনো পার্টিতে এঁদেরই কারো সাথে আপনার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। আর বাজি ফেলে বলতে পারি নিজেদের অতীত গোপন রেখেছেন এরা সকলেই। এত বিবর্ণ ছবিগুলো সে খুব শক্ত চেনা।

উঠে দাঁড়ালেন পোয়ারো। ডঃ রেগুল, এবার আমি উঠছি। আপনি আমার জন্য অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করলেন।

–কিন্তু বোধহয় বিশেষ কাজে লাগাতে পারলাম না। একটু অপেক্ষা করুন আমার স্ত্রীকে ডাকছি। তার দেখার খুব ইচ্ছে আপনাকে।

–শেলা, শেলা, হলঘরে গিয়ে ডাক্তার ডাক দিলেন, মৃদু সাড়া পাওয়া গেল ওপর থেকে।

–দেখ কে এসেছেন।

রোগা ফর্সা হালকা রংয়ের চুলের একজন মহিলা নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে।

-শেলা, ইনি মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো।

ওহ, এত অবাক হয়ে গেলেন মিসেস রেগুল যে কোনো কথা যোগালো না ওঁর মুখে। ওকে অভিবাদন জানালেন পোয়ারো। শেলা বললেন, আমরা জানতাম এখানে আপনি এসেছেন কিন্তু....

স্বামীর দিকে চকিতে শেলা তাকালেন।

মনে মনে পোয়ারো ভাবলেন মহিলা নিতান্তই স্বামীর অনুগত। উনি বিদায় নিলেন আরও দু চার কথার পর। পোয়ারো হান্টার্স প্লেস এসে ওয়েদারবির খোঁজ করলেন। তরুণী বিদেশী পরিচারিকাটি তাকে হলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রেখে খবর দিতে গেল ভেতরে। ঘরটা দেশী বিদেশী নানা জিনিসে বোঝাই। সযত্নের ছাপ নেই কোনো কিছুতেই। একটি মেয়ে কিছুক্ষণ বাদে ঘরে ঢুকল।

-শুয়ে আছেন আমার মা। বলুন আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি?

–আপনি মিস ওয়েদারবি?

–হেণ্ডারসন, আমার সৎপিতা মিঃ ওয়েদারবি।

ত্রিশের কাছাকাছি বয়স মেয়েটির। অত্যন্ত সাদামাটা চেহারা কিন্তু বেশ উদ্বিগ্ন চোখের দৃষ্টি।

মিস হেণ্ডারসন, এখানে আমি এসেছি, আপনাদের পরিচিতা মিসেস ম্যাগিনটির সম্বন্ধে কিছু যদি বলতে পারেন, তা জানতে। আপনাদের গৃহস্থালির কাজকর্ম উনি করতেন শুনেছি।

-মিসেস ম্যাগিনটি, কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন।

শান্তস্বরে পোয়ারো উত্তর দিলেন, আমি জানি। কিন্তু কিছু জানতে চাই তার সম্বন্ধে।

-ও। জীবনবীমা সংক্রান্ত ব্যাপার?

–না। এখানে পূর্ণতদন্তের জন্য এসেছি।

–পূর্ণতদন্ত? মানে ওর মৃত্যুর ব্যাপারে?

সরকার পক্ষ থেকে জেমস বেন্টলীর অপরাধের সত্যতা যাচাই করতে নিয়োগ করা হয়েছে আমাকে।

–কিন্তু সে কি অপরাধী নয়?

-তাই ভেবেছে পুলিশ। কিন্তু ভুলও তো হতে পারে।

–তাহলে এমন কি হতে পারে যে, অন্য কেউ ভদ্রমহিলাকে খুন করেছে?

হতে পারে।

আচমকা মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কে?

–সেটাই তো জিজ্ঞাস্য। মৃদুস্বরে পোয়ারো জবাব দিলেন।

–কিছুই তো আমি বুঝতে পারছি না।

–কিন্তু আপনি মিসেস ম্যাগিনটি সম্বন্ধে কিছু তো বলতে পারেন?

–হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি জানতে চান?

–এই ধরুন, ওঁর সম্বন্ধে আপনি কি ভাবতেন?

–তেমন কিছু নয়। উনি ছিলেন আর পাঁচজনের মতই।

-খুব কথাবার্তা বলতেন, না চুপচাপ? কৌতূহলী না নির্বিকার? হাসিখুশী না দুঃখী দুঃখী, খুব ভালো না অন্য রকম ভদ্রমহিলা? একটু চিন্তা করলেন মিস হেণ্ডারসন।

-উনি ভালোই কাজকর্ম করতেন। তবে কথা বলতেন বড় বেশি। এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা....। সত্যি বলতে কি ওকে আমি তেমন পছন্দ করতাম না।

–ওদের পরিচারিকাটি দরজা খুলে মুখ বাড়ালো।

–মিস, আপনার মা বলছেন তার কাছে ভদ্রলোককে নিয়ে যেতে।

পেয়ারার দিকে তাকালেন মিস হেণ্ডারসন।

–দেখা করতে চান আমার মায়ের সাথে?

–নিশ্চয়ই।

মিস ডীডার হেণ্ডারসন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পোয়ারোকে বলল, এইসব বিদেশীরা...

বুঝতে পারলেন পোয়ারো যে, তাদের কাজের মেয়েটির কথা বলছে ডীডার। তাই নিজে বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও রাগ করলেন না তিনি। তার খুব সহজ সরল মেয়ে বলেই মনে হল ডীডারকে।

নানা টুকিটাকি জিনিসে ভর্তি ওপরের ঘরটা। দেখলেই বোঝা যায় অনেক দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন ভদ্রমহিলা এবং ঝোঁক খুব বেশি পছন্দসই জিনিস কেনার দিকে। যেন আসবাবপত্রও বেশি বেশি ঘরে। একটা সোফায় মিস ওয়েদারবি আয়েস করে শুয়ে ছিলেন। চার পাশে তার বই কেনার সরঞ্জাম, কমলালেবুর রস গ্লাসে আর চকোলেট আর এক গ্লাস।

ভদ্রমহিলা বললেন, নিজে আমি উঠে গিয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারিনি সেজন্য ক্ষমা করবেন। আমাকে ডাক্তার আজ পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। আর কথা না শুনলে আমায় বাড়ির লোক বকাঝকা করে।

পোয়ারো তার সাথে করমর্দন করলেন। ডীডার পেছন থেকে বলে উঠল, উনি জানতে চান মিসেস ম্যাগিনটি সম্বন্ধে কিছু।

পোয়রোর হাতের মধ্যে ধরা মিসেস ওয়েদারবির হাত শক্ত হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য। ভদ্রমহিলাই তারপরই হাসলেন।

–ডীডার, তুমি কি অদ্ভুত কথাবার্তা বলছ, মিসেস ম্যাগিনটি আবার কে?

–ওহ মা, মনে পড়ছে না তোমার, আমাদের বাড়িতে উনি কাজ করতেন... আরে যিনি খুন হলেন।

চোখ বন্ধ করে ভদ্রমহিলা একটু শিউরে উঠলেন।

-আমাকে আর ও কথা মনে করিয়ে দিও না। আমি ভালোভাবে কতদিন পর্যন্ত ঘুমোতে পারিনি। বেচারা বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা। কেউ মেঝের নিচে ওভাবে টাকা রাখে? ব্যাঙ্কে রাখা উচিত ছিল। এইবার সব মনে পড়েছে আমার। আসলে মনে করতে পারছিলাম না ওর নামটা।

ডীডার বলল, মা, সে ব্যাপারেই উনি কিছু জানতে এসেছেন। মিসেস ওয়েদারবি বললেন, মঁসিয়ে পোয়ারো বলুন। ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে আমার। এইমাত্র মিসেস রেগুল ফোনে বললেন বিখ্যাত একজন অপরাধ বিশেষজ্ঞ এখানে এসেছেন আপনার বর্ণনাও দিলেন। তারপরই ফ্রিডা যখন আমাদের কাজের মেয়েটি এসে বলল আমার সাথে দেখা করতে এসেছে একজন ভদ্রলোক তখনই বুঝলাম আপনি এসেছেন। একবার বলুন তো কি হয়েছে?

–ওই, আপনার মেয়ে যা বলল আপনাকে। মৃতা মহিলার সম্বন্ধে আমি জানতে চাই কিছু। উনি প্রতি বুধবার এখানে কাজে আসতেন এবং উনি মারা যান কোনো এক বুধবার। মারা যান যেদিন সেদিনও কাজে এসেছিলেন। তাই না?

–হ্যাঁ, মনে তো হচ্ছে তাই। ঘটনাটা এতোদিন আগের যে আমার সঠিক মনে নেই।

–সে তো ঠিকই। আচ্ছা, উনি কি কোনোদিন বিশেষ কোনো ঘটনার কথা বলেছিলেন?

বিরক্ত স্বরে মিসেস ওয়েদারবি বললেন, এ ধরনের মহিলারা বড় বেশি বাজে বকেন। আর কে কত কান দেয় বলুন। আর এতো উনি আগে থেকে বলতে পাবেন না যে, সর্বস্ব ওঁর চুরি যাবে এবং খুন হবেন উনি।

–খুন হবার ওঁর কারণ আছে।

ভ্রূ কুঁচকালেন মিসেস ওয়েদারবি।

-মঁসিয়ে, বুঝতে পারছি না আমি, আদপে কি বলতে চাইছেন আপনি?

–আমি নিজেও এখন পর্যন্ত ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। যাক গে, আপনারা রবিবারে কি কি কাগজ নেন?

নীল চোখ ভদ্রমহিলার ঈষৎ বিস্ফারিত হল।

–দ্য অবজারভার আর সানডে টাইমস নিই। কেন বলুন তো?

–এমনি। মিসেস ম্যাগিনটি সানডে ক্যানিয়ন আর নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড নিতেন।

পোয়ারোর এ কথায় কেউ কোনো মন্তব্য করল না। খানিকক্ষণ বাদে মিসেস ওয়েদারবি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এত নৃশংস পুরো ব্যাপারটা। সে ভাবতে পেরেছিল এ রকম

ভাড়াটে ছেলেটি। মানসিক দিক দিয়ে হয়ত ও অসুস্থ। অথচ এত শিক্ষিত.... ভাবলে খারাপ লাগে খুব।

–হুঁ।

–সত্যি। খুনটা এত নিষ্ঠুর ভাবে করা হয়েছে–শেষমেশ কিনা মাংস কাটার ছুরি। ওফ!

–পুলিশ কিন্তু শেষ পর্যন্ত পায়নি অস্ত্রটা।

–কে জানে, হয়ত ফেলে দিয়েছে কাছাকাছি কোনো পুকুরে বা ডোবায়।

ডীডার বলে উঠল, সেসব জায়গাতেও সব খুঁজেছে পুলিশ, আমি দেখেছি।

–ডীডার, এখন থাক এসব কথা। অসুস্থ বোধ করছি আমি। আমার স্নায়ু তো দুর্বল তা জানো।

পোয়ারোর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডীডার বলল, চলুন যাওয়া যাক, বড় দুর্বল প্রকৃতির মানুষ হলেন মা। গোয়েন্দা গল্প পড়াটুকুও পোষায় না মায়ের।

–সত্যি আমি দুঃখিত। পোয়ারো একথা বলে উঠে দাঁড়ালেন, মিসেস ওয়েদারবি, বাধ্য হয়েই কতকটা বিরক্ত করতে এসেছিলাম কারণ বেন্টলী হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই ফাঁসি কাঠে ঝুলবে। অথচ যদি সে প্রকৃত অপরাধী না হয়..

কনুইতে ভর দিয়ে মিসেস ওয়েদারবি আধশোওয়া হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কিন্তু সত্যিই সে তো খুনী।

–কিন্তু মাদাম, আমি যে তাতে এখনো নিশ্চিত নই।

দ্রুতপায়ে, পোয়ারো ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ডীডার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তাকে জিজ্ঞেস করল, ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন আপনি?

-যা আমি বললাম, মাদমোয়াজেল।

–হ্যাঁ কিন্তু....থেমে গেল ডীডার। চুপ করে রইলেন পোয়ারো। আবার ডীডার বলল, মাকে অস্থির করে তুলেছেন আপনি। উনি খুন, ডাকাতি এসব ভীষণ ঘেন্না করেন নৃশংসতাও।

–মিস ম্যাগিনটি তো তা হলে মারা যেতে উনি খুবই আঘাত পেয়েছেন বলতে হবে। ভদ্রমহিলা হাজার হোক কাজ করতেন এখানে।

-সে তো একশোবার।

–বোধহয় মাকে সব কথা বলেনও ন আপনারা?

–না, আসলে কম উত্তেজিত করা যায় যতটা এই আরকি।

–যুদ্ধের সময়?

–বিশেষ বোমাটোমা পড়েনি এখানে।

–আপনি তখন কি করতেন?

–সাহায্যকারীদের দলে ছিলাম আমি। বাড়ি থেকে দূরে কোথাও যেতে পারিনি। আমাকে সর্বদা দরকার হয় মায়ের। ঠিকমত কাজের লোকও ছিল না। সেজন্য খুব সুবিধে হয় আমাদের মিসেস ম্যাগিনটিকে পাওয়াতে। বেশ ভালোই কাজকর্ম করতেন উনি। অবশ্য পরিস্থিতিই তো যুদ্ধের জন্য কত বদলে গেছে।

–সেটা আপনি পছন্দ করেন না। না?

–নিশ্চয়ই না। অবশ্য মায়ের কোনো বিকার নেই সর্বক্ষণই উনি অতীতের মধ্যে ডুবে আছেন।

পোয়ারোর নজরে পড়েছিল মিসেস ওয়েদারবির ঘরে নানা পুরনো জিনিসে ভর্তি দেরাজটা।

মৃদুস্বরে বললেন পোয়ারো, পুরনো জিনিসপত্র অনেকে জমাতে ভালোবাসে, বাজে জিনিসও। তাতে আরও বেশি পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে।

–তা হবে। এ সবের মানে আমি বুঝি না কিন্তু জমিয়ে রাখি না নিজে। ফেলে দিই সব।

–তাহলে আপনি ভবিষ্যতের দিকেই তাকিয়ে থাকেন, অতীতের দিকে নয়?

আস্তে আস্তে ডীডার বলল, আমি বুঝতে পারি না আমি ঠিক কোনদিকে তাকিয়ে আছি। যথেষ্ট বর্তমানই তাই না?

খুলে গেল সামনের দরজাটা। লম্বা বয়স্ক একজন ভদ্রলোক পোয়ারোকে দেখে ভীডারের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করলেন।

ডীডার বলল, আমার সৎপিতা ইনি।

–আমি এরকুল পোয়ারো। চোখে মুখে মিঃ ওয়েদারবির কোনো ভাবলক্ষণ দেখা গেল না। ও আচ্ছা, এই বলে তিনি নির্বিকার ভাবে গায়ের কোটটা খুলে হ্যাঁঙারে ঝুলিয়ে রাখলেন।

এবার ডীডার বলল, মিসেস ম্যাগিনটি সম্পর্কে ইনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছেন।

দু-এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর মিঃ ওয়েদারবি বললেন, বেশ কয়েক মাস আগে উনি মারা গেছেন। ওর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। জানলে তা নিশ্চয়ই পুলিশকে বলতাম।

এবার ঘড়ির দিকে তাকালেন মিঃ ওয়েদারবি।

-ডীডার, আশা করি আর পনেরো মিনিটের মধ্যে দুপুরের খাওয়া আমরা শুরু করতে পারব?

–না, বোধহয় আজ একটু দেরি হবে।

–কেন?

–ফ্রীড়া খুব ব্যস্ত ছিল।

-ডীডার, তোমাকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে ঘরের কাজকর্ম ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব তোমার। তোমার কাছে আর একটু বেশি সময় জ্ঞান আশা করি আমি।

দরজা খুলে পোয়ারো বেরিয়ে এসে পেছন ফিরে তাকালেন। মিঃ ওয়েদারবির দৃষ্টিতে সৎ মেয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। আর অন্য জনের দৃষ্টিতে যা ছিল তা সৎপিতার প্রতি নিছক ঘৃণা।

তৃতীয় সফর

১০.

পোয়ারো মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য তার তৃতীয় সফরটা মুলতুবী রেখেছিলেন। আধসেদ্ধ মাংস, নরম জল জল আলুসেদ্ধ আর প্যানকেক অবশ্য মরিনের কথা যদি মানতে হয় খাবারের তালিকায়। কি যে অদ্ভুত খেতে।

পোয়ারো টিলা বেয়ে উঠতে লাগলেন। ল্যাবারনাম এসে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। দুটো কটেজ মিলিয়ে একটা করা হয়েছে, আধুনিক মোটামুটি। রুচিসম্মত ভাবে তৈরি মিসেস আপওয়ার্ড এবং তার পুত্র উদীয়মান নাট্যকার রবিন আপওয়ার্ড থাকেন এখানে।

ভেতরে গেট দিয়ে ঢোকবার আগে এক মুহূর্ত থামলেন পোয়ারো। গোঁফটা একবার হাত দিয়ে ঠিক করে নিলেন। ঠিক এই সময় খুব ধীরে ধীরে টিলা থেকে একটা গাড়ি নামছিল আর একটা আধখাওয়া আপেল উড়ন্তবস্থায় এসে ঠিক করে তার গালে লাগল।

হতচকিত পোয়ারো চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাতেই থেমে গেল গাড়িটা আর গাড়ির জানলা দিয়ে বেরিয়ে এল একজনের মাথা।

-ওহ ভীষণ দুঃখিত। খুব কি লেগেছে আপনার? উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিতে যাবার মুহূর্তে প্রশ্নকারিণীর দিকে পোয়ারো তাকালেন।

গোবেচারা, মুখ ঘন ভুরু, ধূসর রংয়ের একরাশ চুল দেখেই চিনতে পারলেন তিনি মহিলাটিকে (অবশ্য খাওয়া আপেল ছুঁড়ে ফেলার অভ্যেসটাও এই চেনার ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল)।

–আরে আপনি? মিসেস অলিভার।

সত্যিই তাই। ভদ্রমহিলা হলেন বিখ্যাত রহস্যকাহিনী লেখিকা মিসেস অলিভার।

উচ্ছ্বসিতা অলিভার গাড়ি থেকে নামতে উদ্যত হলেন। ছোট গাড়িটা অথচ মিসেস অলিভার বিশালবপু। পোয়ারো ওর দুর্দশা দেখে সাহায্য করলেন ওঁকে।

মিসেস অলিভার কৈফিয়ত দেবার সুরে বললেন, খিল ধরে গেছে হাতে পায়ে গায়ে, অনেকক্ষণ গাড়িতে তো।

একরাশ আপেল ওর নামার সঙ্গে সঙ্গে গড়াতে গড়াতে মাটিতে পড়ল।

–ফেটে গেল ব্যাগটা, বুঝলেন মঁসিয়ে।

জামা ঝেড়েঝুড়ে আরও তিনি কয়েক টুকরো আপেল বের করে বেশ গর্বিত ভাবে তাকালেন পোয়ারোর দিকে।

–এগুলো বাক্সের আপেল ছিল। যাকগে, নিশ্চয়ই আপেলের অভাব এদিকেও থাকবে না। আবার যা কপাল আমার, হয়ত অন্য জায়গায় সবই চালান হয়ে গেল। থাক ওসব, বলুন কেমন আছেন? আপনি নিশ্চয়ই এদিকে যাচ্ছেন না? কোনো খুনটুনের ব্যাপারে যে

আপনি এসেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই আমার। যে বাড়িতে আমি অতিথি আশা করি সেই বাড়ির গৃহকর্ত্রী নন?

–কে নিমন্ত্রণ করেছেন আপনাকে?

-ওই যে একটা বাড়ি দেখছেন টিলার ওপর ল্যাবারনাম– একটু নেমে গিয়ে চার্চের পাশে, আমি ওই বাড়িতে যাব। কেমন ভদ্রমহিলা?

চেনেন না আপনি?

–না, একান্ত বৈষয়িক কাজেই এসেছি আমি রবিন আপওয়ার্ড আমার একটা বইয়ের নাট্যরূপ দিচ্ছে কিছু কিছু কাজ আছে আমাদের একসঙ্গে।

-আচ্ছা, মাদাম খুবই আনন্দের কথা।

-না, সেরকম সুখকর কিছু ব্যাপার নয়। যথেষ্ট দুঃখজনক পরিস্থিতি–ভাবতেই পারিনি আমি। কেন যে নাক গলাতে এলাম এ সবের ভেতর। আমার যথেষ্ট আয় হয় বই থেকেই আর আয় বাড়া মানেই কর বাড়া। কখনোই সেজন্য অতিরিক্ত আয়ের দিকে ঝোঁক নেই আমার। কিন্তু আপনি ধারণাই করতে পারবেন না যে সৃষ্টি করা আপনার চরিত্র বা এমন সব কথা বলছে মূল বইতে আদপেই ছিল না। বলতে যান কিছু শুনতে হবে এসব উৎকৃষ্ট নাটকের জন্য দরকার। এই সবই করে রবিন আপওয়ার্ড। ও নাকি খুব চালাক সকলের ধারণা। এটা তো আমার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না যে ও যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমানই হয় তবে একটা মৌলিক নাটক ও নিজে কেন লেখে না? ফিনল্যাণ্ডীয়

আমার গোয়েন্দাটিকে অব্যাহতি দিলেই তো পারে। ওঃ, এখন সে তো আবার ফিনল্যাণ্ডের লোকও নয়। নরওয়ের প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্য একজন। ওহ হো, টুপিটা যে কোথায় ফেললাম। মাথায় হাত দিলেন মিসেস অলিভার।

গাড়ির ভেতর পোয়ারো উঁকি মেরে বললেন, মাদাম আমার মনে হয় ওটার ওপর আপনি বসেছিলেন।

টুপিটা পর্যবেক্ষণ করে মিসেস অলিভার সমর্থন সূচক গলায় বললেন, সত্যিই তাই। যাকগে। শুনুন, যা বলছিলাম। আমি গীর্জায় যাই প্রতি রবিবার আর বিশপ যাই বলুন না কেন, সেটা টুপী পরার থেকেও বেশি সেকেলে ব্যাপার। সেসব কথা থাক এখন। বলুন তো দেখি এবার খুনের ব্যাপারটা। মনে আছে আপনার সেই আমাদের খুনের তদন্তের কথা?

নিশ্চয়ই, খুব ভালো করে।

–মজা হয়েছিল বেশ, না?

–মানে খুন হবার পরের ঘটনাগুলোর কথা বলছি আর কি। কে খুন হল এবার?

–মিঃ শ্যাতানার মত নামীদামী অত কেউ নয়। বয়স্কা একজন মহিলা। টাকাকড়িও তাঁর খোয়া গেছে। প্রায় পাঁচ মাস আগের ঘটনা। হয়ত আপনি কাগজেও পড়েছেন। মিসেস ম্যাগিনটি....অপরাধী সন্দেহে একটি যুবক গ্রেপ্তার হয়েছে এবং শাস্তি স্বরূপ তার ফাঁসির হুকুম জারী করেছে আদালত।

এবং খুন সে করেনি। এক নিঃশ্বাসে মিসেস অলিভার বলে চললেন, খুন সে করেনি কে করেছে আপনি জানেন এবং তা প্রমাণও করবেন। চমৎকার চমৎকার।

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বড় দ্রুত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন আপনি মাদাম। আমি এখনো পর্যন্ত জানি না কে করেছে এই খুনটা আর জানা গেলেও তা প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ।

অধৈর্যভাবে মিসেস অলিভার বললেন, এত ধীরে ধীরে আপনারা পুরুষেরা সব কাজ করেন। আপনাকে খুব শীগগিরই জানিয়ে দেব এ কাজ কে করেছে? বোধহয় এখানকারই কোনো একজন বাসিন্দা। আমায় দু-একদিন একটু ঘুরে দেখার সময় দিন। ঠিক চিনে নেব খুনীকে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যা তীক্ষ্ণ একজন মহিলার... সেটাই অভাব আপনাদের। আমি তো ঠিকই আঁচ করেছিলাম শ্যানার খুনের মামলায়।

পোয়ারো ভদ্রমহিলাকে মনে করিয়ে দিলেন যে, তখন কত দ্রুত উনি নিজের সিদ্ধান্ত বদলাতেন।

–আপনারা পুরুষেরা। কোনো মহিলা যদি আজ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রধান হতেন তবে....

একটা শব্দ হঠাৎ শুনে নিজের এই বদ্ধমূল ধারণা আর অন্তত কয়েকশো বার বলা কথাটি থামিয়ে দিলেন মাঝপথেই।

–হ্যালো। মিসেস অলিভার।

-এই যে আমি, মিসেস অলিভার এই বলে পোয়ারোর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, সংক্ষেপেই সারব আমি।

-না মাদাম না, ব্যস্ততা দেখালেন পোয়ারো। বরং আপনি ঠিক উল্টোটাই করুন।

গেট খুলে রবিন আপওয়ার্ড রাস্তা দিয়ে নেমে এল। তার গায়ে বহু পুরনো প্রায় বিবর্ণ ধূসর রংয়ের ফ্লানেলের ট্রাউজার্স আর স্পোর্ট কোট। টুপি নেই মাথায়। বেশ সুপুরুষ চেহারা।

এরিয়েন রবিন উষ্ণ আলিঙ্গন করল মিসেস অলিভারকে। তার চোখে প্রশংসার দৃষ্টি। মহিলার কাঁধে হাত দুটো রেখে বলল এরিয়েন, আপনার কাহিনীর জন্য নাটকের দ্বিতীয় অংক লেখার চমৎকার একটা পরিকল্পনা মাথায় এসেছে আমার।

-তাই নাকি? বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না মিসেস অলিভার। এই যে রবিন, ইনি মঁসিয়ে এরকুল পোয়ারো।

–আচ্ছা বাঃ বেশ তো, মিসেস অলিভার নিশ্চয়ই আপনার সাথে মালপত্র আছে?

–হা গাড়ির পেছনে। গাড়ির পেছনের বুট থেকে রবিন দুটো স্যুটকেস নিয়ে এল।

–এত বিরক্তিকর। নিজের লোক বলতে ঠিক যা বোঝায় তা নেই আমাদের, শুধু ঐ বুড়ি জ্যানেট। একটা না একটা কিছু সব সময় তার লেগেই আছে। যাচ্ছেতাই একেবারে। ওঃ বেশ তো ভারী স্যুটকেস। বোমাটোমা ভেতরে পুরে রেখেছেন নাকি?

রবিন খাড়া রাস্তা দিয়ে উঠতে উঠতে ঘাড় ফেরালো।

-আসুন না, একসঙ্গে কিছু পান করা যাক।

–আপনাকে রবিন বলছে সঙ্গে যেতে, মাসিয়ে, গাড়ির সামনের আসন থেকে মিসেস অলিভার হাতব্যাগ, একটা বই আর পুরনো একজোড়া জুতো বের করতে করতে বলে চললেন, একটু আগে কি আপনি কাঠখোট্টা কথাবার্তা রবিনের সাথে বলতে বারণ করলেন আমায়?

–হ্যাঁ মিসেস অলিভার। যত আন্তরিকতা আপনি দেখাবেন ততই ভালো।

-যদি আমি আপনি হতাম তবে এ ধরনের কথা বলতাম না। যা হোক, এটা তো আপনার ব্যাপার। আপনাকে সাহায্য করব আমি।

রবিন আপওয়ার্ডকে দেখা গেল তার বাড়ির দরজায়।

–চলে আসুন, চলে আসুন। পরে করা যাবে গাড়ির ব্যবস্থাটা আপনাদের দেখার জন্য মামনি অস্থির হয়ে উঠেছেন।

মিসেস অলিভার দ্রুতপায়ে এগোলেন, ওকে অনুসরণ করলেন পোয়ারো।

খুব মনোরমভাবে সাজানো ল্যাবারনাম কুটিরের ভেতরটা। অনুমান করলেন পোয়ারো এর জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু সে অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে। স্বাভাবিকতা

আর সৌন্দর্যের সুষম সংমিশ্রণ ঘটেছে গৃহসজ্জায় অকৃত্রিম ওক কাঠের তৈরি প্রতিটি আসবাবে।

মিসেস লরা আপওয়ার্ড ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা হুইল চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি সুমিষ্ট অভ্যর্থনার হাসি হাসলেন। ষাট বছর বয়স, ধূসর কালচে চুল। এক নজরেই বোঝা যায়, যথেষ্ট উদ্যমী।

লরা একগাল হেসে বললেন, আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত আমি মিসেস অলিভার। মনে হয় আমার, হাতের কাছে আপনাকে পেলেই যারা বই নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করে, আপনি তাদের অপছন্দ করেন। কিন্তু দীর্ঘদিন আমি বাতে অসমর্থ তাই আপনার বিরক্তি উৎপাদন করেও বলতে পারি আপনার বইগুলোই আমার অবসর বিনোদনে প্রধান সঙ্গী।

–মিসেস আপওয়ার্ড, আমার তো এ সৌভাগ্য। (বাচ্চা মেয়ের মত মিসেস অলিভার হাত ওল্টালেন) এই ভদ্রলোক মঁসিয়ে পোয়ারো, বহুকালের বন্ধু আমার। হঠাৎই বহুদিন বাদে আপনার বাড়ির সামনে দেখা হয়ে গেল। আসলে ওর গায়ে গিয়ে লেগেছিল আমার আধখাওয়া আপেলের টুকরো.... অনেকটা সেই উইলিয়ম টেলের মতো ব্যাপারটা...

–মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশী হলাম খুব। রবিন

–কি মামনি?

–পানীয় নিয়ে এস কিছু। কোথায় সিগারেটগুলো?

–ওপরেই আছে টেবিলের।

-মঁসিয়ে, আপনিও লেখক, মিসেস অলিভার বলে উঠলেন, না না, একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা উনি শার্লক হোমসের মতো। খুব বিখ্যাত। একটা খুনের তদন্তে এসেছেন এখানে।

একটা ঠুং করে শব্দ হল–হালকা গ্লাস ভাঙার শব্দের মতো।

লরা বললেন, রবিন সাবধানে কাজ কর। এরপর তাকালেন পোয়ারোর দিকে। –তাই নাকি মঁসিয়ে পোয়ারো?

বিস্মিতভাবে রবিন বলল, তাহলে তো মরিন সামারহেস ঠিকই বলেছে। ও বলেছিল কদিন আগে। একজন গোয়েন্দা এসেছেন এখানে অবশ্য ওর কাছে একটা খুব মজার ব্যাপার। কিন্তু সত্যিই তো ব্যাপারটা গুরুতর তাই না?

মিসেস অলিভার বললেন, নিশ্চয়ই, একজন অপরাধী আপনাদের মধ্যেই লুকিয়ে বসে আছে।

-হ্যাঁ, কিন্তু খুন হল কে? নাকি কিছু পাওয়া গেছে মাটি খুঁড়ে? এসব নিয়ে কি পুলিশ গোপনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে?

-মোটেই না, কোনো গোপনীয়তার কারণই নেই। আপনারা খুনের ঘটনাটা সকলেই জানেন।

–মিসেস ম্যাগি...., ওই রকম কি যেন নামটা বৃদ্ধা কর্মচারিণীর গোছের একজন কেউ মিসেস অলিভার বললেন।

হতাশার সুর রবিনের গলায়–কিন্তু সে তো মিটে গেছে কবেই। আবার মিসেস অলিভার বললেন মোটেই মেটেনি। ভুল লোককে ধরেছে ওরা। আসল খুনীকে মঁসিয়ে পোয়ারো ধরতে না পারলে ফাঁসিতে ওই বেচারীকেই লটকানো হবে। ভয়ঙ্কর এবং উত্তেজনাপূর্ণ সবটাই।

পানীয় বিলি করল রবিন–মামনি, তোমার জন্য হোয়াইট লেডি।

–রবিন ধন্যবাদ লক্ষ্মী ছেলে। সামান্য ভুরু কুঁচকালেন পোয়ারো।

মিসেস অলিভার এবং তাকেও পানীয় দিল রবিন। তারপর বলল, আসুন, আপনার সাফল্য কামনা করে পান করা যাক।

রবিন পান করতে করতে হঠাৎ বলল, আমাদের এখানে উনি কাজ করতেন।

-মিসেস ম্যাগিনটি? মিসেস অলিভার জিজ্ঞেস করলেন।

–হ্যাঁ, তাই না মামনি?

–হ্যাঁ, অবশ্য তাকে যদি কাজ বল। সপ্তাহে একদিন সে আসত। দুপুরের দিকে কখনো কখনো এসে হাজির হত, অসময়ে।

-উনি কেমন ছিলেন? মিসেস অলিভার জিজ্ঞাসা করলেন।

-যথেষ্ট প্রশংসা করবার মত। আর বড় পরিষ্কার, পরিষ্কার বাতিক ছিল। খুব গুছিয়ে রাখতেন সব জিনিস। যা পেতেন হাতের কাছে চালান দিতেন দেরাজের মধ্যে, কাজের জিনিস খুঁজে বের করা মুশকিল হত।

মিসেস আপওয়ার্ড বললেন, কিন্তু যদি সপ্তাহে একদিনও ঘর না পরিষ্কার করা হয়, তবে আর ঘরে পা ফেলা যাবে না।

–হ্যাঁ মামনি। কিন্তু দরকারী কাগজপত্র সব আমার ওলট পালট হয়ে যায়।

–তা অবশ্য ঠিক। তবে পুরনো কাজের মেয়েটি আমাদের শুধু রান্নাই করতে পারে।

–আপনার কি আর্থারাইটিস আছে? মিসেস অলিভার জিজ্ঞাসা করলেন।

হয়ত ভবিষ্যতে নামের ওপর চব্বিশ ঘন্টাই নির্ভর করতে হবে অথচ মনে প্রাণে আমি স্বনির্ভর হতে চাই। আমার একেবারে মেয়ের মত রবিন। আমার সব কাজ ও করে দেয়।

উঠে পড়লেন পোয়ারো। এবার আমায় যেতে হবে আর একজনের বাড়ি হয়ে ট্রেন ধরব মিসেস আপওয়ার্ড, ধন্যবাদ আপনার আতিথেয়তার জন্য।

মিসেস অলিভার বললেন, শুভেচ্ছা রইল খুনের তদন্তের জন্য। রবিন বলল, এটা কি সত্যি খুব দরকারী না ঠাট্টা করছেন আপনি?

-না না, খুবই দরকারী এটা। খুনীর নামটাও উনি জানেন, কিন্তু বলবেন না।

-আরে না না। সত্যিই আমি অতদূর এগোইনি। মৃদু আপত্তি তুললেন পোয়ারো। মিসেস অলিভার বললেন, বলছেন বটে আপনি তবে আমার ধারণা সবই জানেন আপনি। আপনার গোপন করা স্বভাব....

মিসেস আপওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি সত্যি না শুধুই কৌতুক?

–না, কৌতুক নয় এটা–পোয়ারো অভিবাদন করে বিদায় নিলেন।

তিনি পথে নামতে নামতে রবিনের কথা শুনতে পেলেন।

–কিন্তু এরিয়েন, সবই ভালো অথচ ঐ গোঁফটোফ দেখলে ইচ্ছে করে না বিশ্বাস করতে। কি বলছ তুমি, সত্যি উনি কাজের লোক?

নিজের মনে পোয়ারো হাসলেন। সরু রাস্তাটা পার হতে গিয়ে থামলেন। মিঃ সামারহেসের স্টেশন ওয়াগনটা এসে পড়েছে। গলা পাওয়া গেল ওঁর যেতে হবে স্টেশনে, কনভেন্ট গার্ডেনের ট্রেনটা ধরা দরকার।

ট্রেন ধরারও তাড়া ছিল পোয়ারোর। স্পেন্সের সঙ্গে দেখা করার জন্য উৎসুক তিনি।

পাহাড়ের গা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি একটা ছোট্ট আধুনিক ফ্যাশনের বাড়ির সামনে এসে থামলেন। মিঃ আর মিসেস কার্পেন্টারের বাড়ি এটাই। বেশ ধনী এবং বিখ্যাত ভদ্রলোক তিনি। কাপেন্টার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়াকর্স-এর মালিক। ভদ্রলোক এখন রাজনীতি করেন। সদ্য বিবাহিত।

একজন ভৃত্য বাড়ির দরজা খুলে দিল। কোনো জিনিস বিক্রি করতে এসেছে ভেবে কেউ নেই বাড়িতে বলে পোয়ারোর মুখের ওপর বন্ধ করে দিল দরজা।

পোয়ারো ডেকে বললেন, তাহলে আমি অপেক্ষা করছি।

–ওঁরা ফিরবেন কখন আমি জানি না।

পোয়ারো নিরাশ হয়ে ফিরে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। তার নজরে পড়ল একজন ভদ্রমহিলা। পিংক কোট মহিলার পরনে।

–হ্যালো, কি চান আপনি?

–মিঃ আর মিসেস কার্পেন্টারের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। আপনিই মিসেস কার্পেন্টার?

-হ্যাঁ।

–আমি এরকুল পোয়ারো।

মহিলার মনে নামটি খুব বেশি রেখাপাত করল না। তিনি জানতেন না যে, মিসেস সামারহেসের অতিথি পোয়ারো।

–বলুন, কি দরকার আপনার?

–সাংসারিক বিষয়ে আমি কতকগুলো খবর জানতে চাই।

–আমরা কিন্তু কিছু কিনতে চাই না।

–ভুল বুঝেছেন আপনি, শুধু কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই আমি।

–আচ্ছা, ভেতরে আসুন আপনি।

যে ঘরে পোয়ারো ঢুকলেন, রুচিসম্মতভাবে সেটা সাজানো। কোথাও আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই।

-বসুন মিঃ পোয়ারো।

–জানতে এসেছি মিসেস ম্যাগিনটির সম্বন্ধে। উনি গত নভেম্বরে মারা গেছেন।

–মিসেস ম্যাগিনটি, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

–মনে করতে পারছেন না?

–না।

–খুন হয়েছিলেন উনি।

–ও হ্যাঁ, আমি ভুলে গিয়েছিলাম ওঁর নামটা।

–এখানে উনি কাজ করতেন?

–না, আমি জানি না। মাত্র তিন মাস আগে আমার বিয়ে হয়েছে।

-উনি কিন্তু কাজ করতেন আপনার বাড়িতেও, প্রতি শুক্রবার সকালে। রোজ কটেজে – তখন আপনার পচিয় ছিল মিসেস সেলকার্ক।

-যদি আপনি সবই জানেন, তবে কেন শুধু শুধু জিজ্ঞেস করছেন? আর কেনই বা এত সব জানতেন বা চাইছেন?

তদন্ত করছি আমি।

–কেন এসেছেন আমার কাছে?

–হয়ত আপনি কিছু জানতে পারেন এই ভেবে।

–কিছু জানি না আমি। উনি নিতান্তই নির্বোধ ছিলেন। কেউ টাকা রাখে মাটির নিচে? সেজন্যই তো ওঁকে কেউ খুন করল। রবিবারের কাগজের খবরের মত আজগুবি যত কাণ্ড।

-রবিবারের কাগজ মানে, সানডে কম্প্যানিয়ন?

লাফিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা। চেঁচাতে লাগলেন জানলার কাছে গিয়ে গীই গীই.....

–ইভ, কি বলছ?

–একবার এস শীগগির।

বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে জানলার কাছে এলেন এক ভদ্রলোক।

ইভ বললেন, বিদেশী ভদ্রলোক এসেছেন একজন। যে ভদ্রমহিলা গত বছরে খুন হয়েছিলেন সেই ব্যাপারে কি সব আজেবাজে প্রশ্ন করছেন আমায়। এসব আমি অপছন্দ করি তুমি জানো।

ভদ্রলোক জানলা টপকিয়ে ঘরে এলেন।

–কি মশাই, বিরক্ত করছেন আমার স্ত্রীকে?

–না, না, ছিঃ। তদন্তের ব্যাপারে আমি ভেবেছিলাম উনি আমায় সাহায্য করবেন।

–কিসের তদন্ত?

–মিসেস ম্যাগিনটির হত্যার ঘটনার। পূর্ণতদন্ত হচ্ছে।

–কিন্তু সে তো চুকে গেছে।

–না, যায়নি।

–পুলিশ করছে। কিন্তু আপনি তো মনে হচ্ছে পুলিশ পক্ষের নন বলেই।

–আমি নিরপেক্ষ তদন্তে নেমেছি পুলিশের অনুরোধে।

–দেখ, নিশ্চয়ই কোনো প্রেস থেকে এই ভদ্রলোক এসেছেন, কোনো রবিবাসরীয় পত্রিকার তরফ থেকে।

সতর্কতার আভাস মিঃ কার্পেন্টারের চোখে।

-আমার স্ত্রী খুব নরম প্রকৃতির মানুষ। ওই ভদ্রমহিলাকে উনি প্রায় চিনতেনই না।

ইভ বললেন, উনি নির্বোধ ছিলেন আর খুব মিথ্যেবাদী।

–তাহলে মিথ্যেবাদী ছিলেন উনি? খুব দরকারী তথ্য এটা। পোয়ারো বললেন।

–কি হিসেবে?

–খুনের কারণ হিসেবে। এ পথেই এগোচ্ছি আমিও।

–কিন্তু শুনেছি টাকাকড়ির জন্য উনি মারা যান।

–তাই কি? মিসেস কার্পেন্টারকে আমি অস্বস্তিতে ফেলার জন্য দুঃখিত।

–আমরা দুঃখিত, কোনো তথ্য আপনাকে সরবরাহ করতে না পারার জন্য।

–কিন্তু তা আপনারা করেছেন।

–আপনি কি বলছেন?

–ওই যে বললেন মিথ্যে বলতেন উনি। আচ্ছা, কি ধরনের মিথ্যে?

–কি জানি, সঠিক মনে নেই আমার। সব বেশির ভাগই আর্যাঢ়ে গল্প, নানা লোকের সম্বন্ধে।

–ওঁর কথাবার্তা তাহলে খুব সাংঘাতিক ছিল, বলুন।

–না, তা ঠিক নয়। গল্পচ্ছলে বলতেন। গল্পচ্ছলে?

বিদায় নিয়ে উঠলেন পোয়ারো, হল পর্যন্ত মিঃ কার্পেন্টার সঙ্গে এলেন।

–রবিবারের পত্রিকা আপনার কোনটা?

আপনার স্ত্রীকে সেটার কথা বলেছিলাম। তা সানডে ক্যানিয়ন।

–সানডে কম্প্যানিয়ন, আমি ওটা বিশেষ পড়ি না।

-মাঝে মাঝে ওটাতে বেশ নতুন ধরনের ঘটনার উল্লেখ থাকে। আমাকে এবার বিদায় দিন। আপনাদের বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।

পোয়ারো ফিরে যেতে যেতে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, অবাক হচ্ছি আমি, সত্যি অবাক হচ্ছি।

.

১১.

সুপারিন্টেডেন্ট স্পেন্স যিনি পোয়ারোর সামনে বসা তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মিঃ পোয়ারো, আমি বলছি না যে, কোনো তথ্য পাননি আপনি। আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি হয়ত কিছু পেয়েছেন আপনি কিন্তু তা বোধহয় খুবই সামান্য। দরকার আরও তথ্য। ওই রবিবারের কাগজটা অনেক আগেই আমার বা আমার সহকারীর নজরে আসা উচিত ছিল।

–আপনি নিজেকে এ জন্যে দোষারোপ করতে পারেন না। যে রকম পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল, তাতে কাগজ দেখার কথা মনেও আসে না।

-তবুও আমাদের ওটা দেখা উচিত ছিল। আর কালির বোতলটা?

–আমি দৈবাৎ ওটার কথা জানতে পারি।

–ওটাও কি কাজের পক্ষে আপনার দরকারী?

–সেটা শুধু চিঠি লেখার কথা ভেবে।

–ঐ চারজন কাগজের মহিলার পুরনো ছবি থেকে কাউকে সনাক্ত করা শক্ত হবে বলে মনে হয়। দিনকাল সব দিক দিয়েই যা পাল্টাচ্ছে।

–আপনারও কি মনে হয় আমার মত যে ভেরা ব্লেককে বাদ দিতে পারি।

–হ্যাঁ। যদি ভেরা ব্লেক এখানে আসত, তবে তার কাহিনী সবাইকে শুনিয়ে বেড়াত।

–আর অন্য তিনজন?

–কেন দেশত্যাগী হয়েছিল ইভা। সে নাম নিয়েছিল ইভলিন হোপ।

–এরকম রোমান্টিক নাম কবিতায় পাওয়া যায়।

–তাহলে কি আসল নাম তার ইভালিন ছিল?

–হ্যাঁ, তবে সে বেশি পরিচিত ছিল ইভা নামেই।

–ইভা কেন সম্বন্ধে কি মনে করে পুলিশ।

–তখন অল্প বয়েস আমার। আলোচনা শুনে বুঝতাম কোনো প্রমাণ না থাকলেও মোটেও নির্দোষ নয় ইভা কেন। সম্ভবত হত্যার পরিকল্পনাটা তারই ছিল। মিঃ ক্রেগের অনুপস্থিতির সুযোগে নিয়েই হয়ত সে হত্যা করেছিল ভদ্রমহিলাকে। তারপর বাড়ি ফিরে মিঃ ক্রেগ ব্যাপার দেখে তাড়াতাড়ি সবকিছু চাপা দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় নিজে।

–জেনিস কোর্টল্যাণ্ড? এডিথ থাপসনকে খুনের দায়ে শাস্তি দিলেও উচিত হয়নি জেনিসকে ছেড়ে দেওয়া।

আর সেও সম্ভবত সরিয়ে দিতে চেয়েছিল স্বামীকে।

–আবার কি পরে জেনিস বিয়ে করে?

সঠিক জানা নেই।

–সে বিদেশে যায়, তারপর? –সে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার পেয়েছিল।

–একটা ককটেল পার্টিতে কোনো সময় যে কেউ তার সাক্ষাৎ হঠাৎ পেতে পারে।

নিশ্চয়ই।

–আর লিলি গ্যাম্বল?

–শাস্তি পাবার পক্ষে ছোট ছিল যথেষ্ট। ও স্কুলে যায় এরপর চাকরি যোগাড় করে শর্টহ্যাণ্ড, টাইপিং শিখে। আর কিছু তার পরের খবর জানা নেই। মনে হয় আমার ওকেও বাদ দেওয়া যেতে পারে। ও একটা খুন করে ফেলেছিল রাগের মাথায়।

–বাদ দিতে পারতাম। কিন্তু বাদ সাধছে মাংস কাটার বড় ছুরিটাই। প্রায় একই ধরনের অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে মিসেস ম্যাগিনটিকেও লিলির পিসীমার মত হত্যা করা হয়েছে।

–হয়ত ঠিকই বলছেন আপনি। আচ্ছা, ঘটনাস্থলের প্রতিবেশীদের সঙ্গে এই চারজনকে মেলাতে গেলে কেমন হয়?

–এখন বেঁচে থাকলে ইভা কেনের বয়স ষাটের কাছাকাছি হত। ত্রিশের কোঠায় তার মেয়ের বয়স। লিলি গ্যাম্বলেরও সেই বয়স। জেনিস কোর্টল্যাণ্ডের প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই হবার কথা।

–হ্যাঁ, হিসেবটা ঠিকই করেছেন।

–এখন দেখতে হবে মিসেস ম্যাগিনটি কার কার বাড়িতে কাজ করতেন।

ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন?

–হ্যাঁ দেখতে হবে। যাদের বাড়িতে উনি কাজ করতেন তাদের খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

–নিশ্চয়ই।

মারা যান যেদিন, সেদিন ওয়েদারবিদের বাড়িতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। ইভা কেনের মতই মিসেস ওয়েদারবির বয়স আর তার মেয়েও ইভার মেয়ের বয়সী হবে। আবার দেখা যাচ্ছে ইভার মেয়েও তার আগের পক্ষের মেয়ে ছিল।

ফটোর সঙ্গে মিলিয়ে বলছেন?

–বন্ধু, ফটোর সাথে মিলিয়ে ঠিক ঠিক বলা কখনোই সম্ভব নয়। আমার মনে হয় যতদূর এককালে মিসেস ওয়েদারবি সুন্দরী ছিলেন। হয়ত আপনারা ভাবছেন উনি অশক্ত মহিলা। কিন্তু আমরা যতক্ষণ না জানতে পারছি সঠিকভাবে যে কোন অস্ত্রটা দিয়ে খুন করা হয়েছে ততক্ষণ কারও শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

–হ্যাঁ, অস্ত্রটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তারপর?

–দেখুন, স্বামীর কানে যাতে অতীতের কলঙ্ক পৌঁছয়, সেজন্যও ভদ্রমহিলা খুন করতে পারেন। আবার ঐ একই কারণে খুনী হতে পারে মেয়েটিও। অন্যদিকে পারিবারিক কলঙ্ক চাপা দেবার জন্য স্বামী ভদ্রলোকটিও হত্যা করতে পারেন। একটা জিনিস ওদের বাড়িতে গিয়ে পরিষ্কার বুঝেছি মেয়েটি মাকে যথেষ্ট ভালোবাসলেও ভীষণ অপছন্দ করে সৎপিতাকে।

সানডে কম্প্যানিয়ন-এর কথা চিন্তা করলে সবচেয়ে সন্দেহজনক চরিত্র ওরাই।

-হ্যাঁ। ইভা কেনের বয়সী আর মাত্র একজনই আছেন এখানে। তিনি মিসেস আপওয়ার্ড। কিন্তু দুটো কথা থেকে যাচ্ছে বিপক্ষে। এক উনি আর্থারাইটিসের রুগী হুইল চেয়ারে ঘোরেন সর্বক্ষণই....

–সত্যি না হয়ে হুইল চেয়ারের ব্যাপারটা অভিনয়ও হতে পারে।

–দ্বিতীয়ত, হাবভাব সবই ওঁর ইভা কেনের ঠিক বিপরীত।

–তা ঠিক। খুনী হওয়া যেমন মিসেস আপওয়ার্ডের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতাও তেমন নয়। আর জেনিস কোর্টল্যাণ্ড?

–ঠিক ওই বয়সের কেউ নেই। যদি না নাক উঁচু ভদ্রমহিলার কেউ হন।

এখানে তিনজন ত্রিশোত্তীর্ণ বা ত্রিশের কাছাকাছি ভদ্রমহিলা আছেন। একজন, ডঃ রেগুলের স্ত্রী, আরেকজন মিসেস কার্পেন্টার, শেষজন ডীডার হেণ্ডারসন। এদের মধ্যে আবার যে কেউই লিলি গ্যাম্বল হতে পারে। লম্বা না বেঁটে ইভা কেনের মেয়ে, কেমন গায়ের রং আমরা সে সব কিছুই জানি না। আমার মনে হয় কোনো কারণে মিসেস রেগুল ভয় পেয়েছেন।

-আপনার সম্পর্কে?

–তাই তো মনে হয়। নিশ্চয়ই এর কোনো তাৎপর্য আছে। হয়ত উনি ইভার মেয়ে বা লিলি। ওঁর চুলের রং গাঢ় না হালকা?

www.bengaliebook.com

-হালকা।

–লিলিরও তাই।

–মিসেস কার্পেন্টারের চুলের রঙও হালকা। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ওঁর চোখ। বড় বড় গাঢ় সুন্দর নীল চোখ। যখন উনি দুহাত বাড়িয়ে ডাকছিলেন স্বামীকে, ওকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন বিরাট এক প্রজাপতি।

–মিঃ পোয়ারো বড় ভাবপ্রবণ আপনি।

–মোটেই না। আমার বন্ধু হেস্টিংস, বরং ভাবপ্রবণ সে আর কল্পনাবিলাসী। বলতে চাইছি আমি যে একজন নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য তার চোখে। আচ্ছা...

পোয়ারো এই পর্যন্ত বলে লিলির চশমা পরা ছবির ওপর হাত দিলেন।

–মিঃ পোয়ারো তাহলে আপনি বলতে চান লিলি গ্যাম্বলই....

-না, শুধু সম্ভাবনার দিকটা আমি বিচার করছি। যখন মিসেস ম্যাগিনটি মারা যান, তখন মিসেস কার্পেন্টার ছিলেন বিধবা, যাকে বিয়ে করতে মনস্থ করেন মিঃ কার্পেন্টার। কিন্তু উনি যদি লিলি হন, অথবা ইভা কেনের মেয়ে তবে খোঁজখবর নেবার পর কি ওকে মিঃ কার্পেন্টার বিয়ে করতে রাজী হতেন? ভালোবাসার প্রশ্ন হয়ত তুলবেন আপনারা। কিন্তু যে প্রকৃতির মানুষ মিঃ কার্পেন্টার তাতে মনে হয় ওর কাছে মর্যাদাবোধের তুলনায়

ভালোবাসা তুচ্ছ। তবে এটা খুব স্বাভাবিক হবে যে, ভদ্রমহিলা সর্বদাই কান বাঁচিয়ে চলেছেন ওর স্বামীর।

–তাহলে আপনি ওঁকেই সন্দেহ করেন?

-বারবার তো আপনাকে বলছি যে, এখনো আমি জানি না। শুধু আলোচনা করছি সম্ভাবনার কথা। অত্যন্ত সর্তক মিসেস কার্পেন্টার এবং আমায় সন্দেহের চোখে দেখেন।

–সেটা খুব খারাপ।

-হ্যাঁ। শিকারীর মত হয়েছে আমার অবস্থা। মিসেস কার্পেন্টার যে বললেন মিথ্যেবাদী মিসেস ম্যাগিনটি হয়ত এ কথারও কোনো সঙ্গত কারণ আছে।

–সত্যি সত্যি কি মনে হয় আপনার?

–কি মনে হয় তার চেয়েও বড় কথা কি জানতে হবে আমায়।

–আমরা যেটাকে খুনের কারণ বলে ভাবছি, সেটা কি সত্যিই খুনের কারণ?

–পারিবারিক ব্যাপারের ওপর তা নির্ভর করছে। ব্যক্তিগত কথা সকলেই গোপন করতে চায়। হয়ত সেইজন্যই প্রয়োজন হয়েছিল মিসেস ম্যাগিনটিকে হত্যা করার।

–ওয়েদারবিদের সন্দেহ করেন আপনি?

-না, তাদের যদিও সব কিছুই সন্দেহজনক। স্বভাবের দিক ভাবলে মিসেস ওয়েদারবির চেয়ে মিসেস আপওয়ার্ডের ওপর বেশি হয় সন্দেহটা। অতীত জীবনে হতে পারে এমন কেউ তিনি ছিলেন যা ছেলেকে জানতে দিতে চান না।

–রবিন কি কিছু মনে করবে তেমন কিছু হলে?

–তেমন মনে হয় না আমার। আধুনিক তার দৃষ্টিভঙ্গী। তার মায়ের প্রতি ততটা টান আছে বলে মনে হয় না যতটা আছে তার প্রতি তার মায়ের।

-কিন্তু মায়ের কলঙ্কিত অতীত গোপন রাখার জন্য খুন কি রবিন করতে পারে না?

–না। আমার তো মনে হয় সে বরং এটাকে নিয়ে নাটক লিখতে বসবে, মানে কাজে লাগাবে প্লটটাকে।

খুব শক্ত ব্যাপারটা বোঝা সব রকমের সম্ভাবনা আছে।

–আস্তে আস্তে হয়ত এগোতে পারব।

স্পেন্সের ঘর থেকে পোয়ারো বেরিয়ে এলেন।

তিনি ট্রেনের জন্য কিলচেষ্টার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। একটু ঝুঁকে দেখতে পেলেন ট্রেন আসছে। পিঠে হঠাৎ ধাক্কা খেলেন। লাইনের ওপর একটু হলেই পড়তেন। পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক ঠিক সময়ে তাক ধরে ফেলে সামলে দিলেন।

-কি হল আপনার? আর একটু হলেই তো ট্রেনের তলায় পড়ে খোয়াতে হত প্রাণটা।

–অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে।

–আসুন, সাহায্য করি আপনাকে। ট্রেনের কামরায় পোয়ারোকে ভদ্রলোক তুলে দিলেন।

বুঝতে পারলেন পোয়ারো তাকে কেউ ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তদন্তে নিযুক্ত হওয়াতে তিনি কেউ একজন ভয় পেয়েছে, যে তাকে আজ হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল।

পোয়ারো স্টেশনে পৌঁছে স্পেন্সকে ফোন করলেন।

–মিঃ স্পেন্স, খবর আছে, আমাকে একটু আগে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল কেউ একজন।

না না, কোনো আঘাত লাগেনি আমার তবে আর একটু হলেই মারা পড়তাম। চেষ্টা কে করেছিল জানি না। তবে জানবই। স্পষ্ট বোঝা গেল এবার ঠিক পথেই আমরা এগোচ্ছি।

.

১২.

বৈদ্যুতিক গোলযোগ মেরামতের জন্য গী কার্পেন্টারের বাড়িতে মিস্ত্রী এসেছিল। গৃহ ভৃত্যটি তার কাজে নজর রাখছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল।

–মিটিঙে গিয়েছিলেন কাল আপনি?

–না।

–আপনার মনিব মিঃ কার্পেন্টার বক্তৃতা দিয়েছেন খুব চমৎকার। ওঁর গাড়ি মিটিঙে যাওয়ার সময় সব সময়ই আপনিই চালান তাই না?

–না, নিজে উনি চালাতে ভালোবাসেন। একটা রোলস বেন্টলে গাড়ি আছে ওঁর।

–খুব ভালো গাড়ি। ওঁর স্ত্রীও কি নিজে চালান?

–হ্যাঁ, তবে বড় জোরে।

–ওঁর স্ত্রী ছিলেন কালকের মিটিঙে? নাকি উনি রাজনীতি পছন্দ করেন না?

–ভাব দেখান যেন খুবই পছন্দ করেন। মাথা ধরেছিল বলে মিটিঙের মাঝখানেই উঠে চলে এসেছিলেন গতকাল।

-আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

মিস্ত্রী চলে যাবার পথে নোটবই একটা খুলে লিখল :

গতকাল রাত্রে মি একা গাড়ি চালিয়ে রাত সাড়ে দশটায় বাড়ি ফিরেছে। ওই বিশেষ সময়টাতে কাজেই তার কিলচেষ্টার স্টেশনে উপস্থিতির সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অনেক আগে মিসেস মি মিটিঙ থেকে উঠে রওনা দেন এবং মি র মাত্র দশ মিনিট আগে বাড়ি ফিরেছেন ট্রেনে করে।

নোটবইয়ের আগের পৃষ্ঠায় লেখা ছিল :

ডঃ আর কাল রাত্রে কিলচেষ্টারের দিকে রুগী দেখতে গিয়েছিলেন। সুতরাং ওই সময়ে কিলচেষ্টার স্টেশনে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব ছিল না তার পক্ষে। মিসেস আর সারাক্ষণ বাড়িতে ছিলেন। পরিচারিকা কফি এনে দেবার পর মিসেস স্কাটের কিন্তু তার সাথে দেখা হয়নি। নিজের গাড়ি আছে ভদ্রমহিলার।

.

পুরোদমে নাটক নিয়ে রবিনদের বাড়িতে কাজ চলছে।

–এরিয়েন, নাটকের এই লাইনটা আপনি বুঝতেই পারছেন না। কি চমৎকার!

–হ্যাঁ রবিন।

-কিন্তু আপনার সুখী ভাবা উচিত ছিল নিজেকে। নায়ক এখানে একজন পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক।

-না, ষাট বছরের ভদ্রলোক....

–না না,

–হ্যা নিশ্চয়ই।

–কিন্তু আমার তো মনে হয় পঁয়ত্রিশ বছরের একটুও বেশি হওয়া উচিত নয়।

–গত তিরিশ বছর ধরে ভুলে যাচ্ছ কেন তাকে নিয়ে বই লিখছি। আমার প্রথম বইয়ের এই চরিত্রে তার বয়স পঁয়ত্রিশের কাছে ছিল।

–কিন্তু ষাট বছরের ভদ্রলোকটি হলে সব ব্যাপারটাই গুলিয়ে যাচ্ছে কেমন।

–তাই তো চাই।

–না না, পঁয়ত্রিশ বছরের বেশি করা চলবে না ওকে।

–তা হলে তার আর স্তেন জারসন হওয়া চলবে না, সাধারণ কোনো লোক হতে হবে। –কিন্তু বইতো নায়কের নামেই কাটবে।

-তা বললে চলবে কেন? যারা আমার বই পড়ে সবাই তারা জানে গল্পের নায়ক আমার কেমন। নিশ্চয়ই নতুন করে তুমি নায়ক বানাতে পারো না।

–এটা কিন্তু বই নয়, নাটক। দর্শকের তো আমাদের ভালো লাগা দরকার।

–একটু বাইরে থেকে আমি ঘুরে আসছি।

–আমি সাথে যাব?

–না থাক।

–একটু চিন্তা করবেন নাটকটার কথা।

মিসেস অলিভার পথ চলতে চলতে আগাগোড়া খুঁটিয়ে ভাবতে লাগলেন। এরকুল পোয়ারোকে সাহায্য করা খুব দরকার।

তিনি পোস্ট অফিসে এসে আলাপ জমালেন মিসেস সুইটিম্যানের সঙ্গে।

–আমি আপনাকে চিনি। তিনখানা বই আছে আপনার আমার কাছে। এই দেখুন না, এখানেই আছে। হত্যা রহস্যের কাহিনী আপনি লেখেন, তাই না?

বইগুলোর দিকে মিসেস অলিভার নজর দিলেন। দ্বিতীয় সোনালী মাছের কীর্তি-বইটা মন্দ নয়। বেড়ালের মৃত্যু বইটারও খুব কাটতি হয়েছিল।

–সবই খুব ভালো বইগুলো, মিসেস সুইটিম্যান বললেন, এর একখানাও যদিও ভালো করে পড়ার সময় হয়নি আমার।

–আপনাদের এখানেই তো একটা খুন হয়েছে?

–হ্যাঁ, গত নভেম্বরে। বলতে গেলে একেবারে পাশেই।

–একজন গোয়েন্দা এসেছেন।

–ও, ছোটোখাটো সেই বিদেশী ভদ্রলোক? গতকাল উনি এখানে এসেছিলেন আর...

মিসেস সুইটিম্যান অন্য খরিদ্দার সামলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একজন তরুণী পোস্ট অফিসে ঢুকতেই তিনি বললেন, মিস হেণ্ডারসন গুড মর্নিং, বেশ গরম আজ না? কেমন আছেন আপনার মা মিসেস ওয়েদারবি?

-ভালোই। খুব একটা বাইরে বেরোন না আজকাল।

–একটা দারুণ ছবি (সিনোমা) এসেছে কিলচেস্টারে।

–ভেবেছিলাম কাল যাব, কিন্তু আর হয়ে উঠল না।

পোস্ট অফিস থেকে মেয়েটি বেরিয়ে গেলে মিসেস অলিভার বললেন, মিসেস ওয়েদারবি পঙ্গু, না?

–সম্ভবত। এদের হাত পা একটু চালনা করা দরকার।

–হ্যাঁ, আমিও ও কথা বলবো ভাবছি মিসেস আপওয়ার্ডকে।

সবাই ইচ্ছে করলেই এঁরা উঠতে পারেন।

–সত্যি নাকি?

যাবার জন্যে মিসেস অলিভার পা বাড়ালেন। ডীডার হেণ্ডারসনের সাথে পথেই দেখা হল। ডীডারের সঙ্গে ছিল তার কুকুর।

-কি সুন্দর কুকুর!

–সত্যি খুব সুন্দর না? বেন, খুব সুন্দর তুমি। আহ্লাদে কুকুরটা ল্যাজ নাড়তে লাগল।

–তোমার বেন কি ঝগড়া করে? খুব ঝগড়াটে হয় এই জাতের কুকুররা।

–ঠিক বলেছেন। সেজন্য আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরোই।

–তাই ভাবছিলাম আমিও। হঠাৎ ডীডার বলে উঠল, এরিয়েন অলিভার আপনি তাই না?

–হ্যাঁ। মিসেস আপওয়ার্ডের ওখানে আমি আছি।

–আপনি আসছেন রবিন বলেছিল। আমার খুব ভালো লাগে আপনার বই।

মিসেস অলিভার লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন।

–জানেন, এই ধরনের বই পড়তে আমি খুব ভালোবাসি কিন্তু স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ে বলে মা বিশেষ পড়তে দেন না।

-আপনাদের এখানে তো সত্যিকারের খুন হয়েছে।

–হ্যাঁ, ওই বাড়িটায়।

মিসেস অলিভার তাকালেন মিসেস ম্যাগিনটির বাড়ির দিকে। একটা বেড়ালকে দুটি বাচ্চা জ্বালাতন করছিল। বেড়ালটা সুযোগ পেয়ে আঁচড় দিয়ে পালালো।

বেশ হয়েছে। স্বগোতোক্তি করলেন মিসেস অলিভার।

-মনেই হয় না এই বাড়িটা দেখে কেউ খুন হয়েছে এখানে, তাই না?

—যা বলেছেন।

-বৃদ্ধা একজন মহিলা। না? আর বোধহয় ওর টাকাও খুনী চুরি করেছিল?

–ওঁর পেয়িংগেস্ট। টাকা ছিল মাটির নিচে।

–ও।

হঠাৎ ডীডার বলে উঠল, হয়ত ও মোটেই খুন করেনি। এক বিদেশী ছোটোখাটো চেহারার ভদ্রলোক। এরকুল পোয়ারো এই সব বলছিলেন।

–এরকুল পোয়ারো? আমি খুব ভালোভাবে ওকে জানি?

–সত্যি কি উনি ডিটেকটিভ?

উনি খুব চালাক আর অসম্ভব জনপ্রিয়।

-উনি হয়ত তাহলে সত্যিই প্রমাণ করতে পারবেন যে ও খুনটা করেনি।

কে?

–ওই জেমস বেন্টলী। মনেপ্রাণে আমি চাই যেন ও মুক্তি পায়।

–তুমি চাও, কিন্তু কেন?

–আমি চাই না যে ও খুনী প্রতিপন্ন হোক। এ ধরনের মানুষ নয় ও ঠিক।

–ওকে তুমি চেন?

-না, ওর ঠিক পরিচিত নই আমি, আমার কুকুর বেন একবার আটকা পড়েছিল ফাঁদে। বেনকে মুক্ত করার সময় আমাকে ও সাহায্য করেছিল। অল্পক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল। আমাদের মধ্যে।

-কেমন ছেলেটি?

–খুব নিঃসঙ্গ। ভেঙে পড়েছিল মায়ের মৃত্যুর পর। খুব বেশি যোগ ছিল মায়ের সঙ্গে।

–তোমার মাকে তুমিও খুব ভালোবাসো।

–হ্যাঁ, তাই আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওর মনের কষ্টটা। শুধু আমি আর মা পরস্পরকে নিয়ে বেঁচে আছি।

-আমাকে রবিন বলেছিল তোমার সৎপিতা আছেন?

–হ্যাঁ, সৎপিতা।

-জানি আমি; এর অনেক তফাত নিজের বাবার সঙ্গে। নিজের বাবার কথা কি তোমার মনে পড়ে?

-না। আমার বাবা মারা যান আমি জন্মাবার আগেই। যখন আমি চার বছরের দ্বিতীয়বার আমার মা বিয়ে করেন। আমি ঘৃণা করি আমার সৎপিতাকে। আমার মা....কোনোদিন ওঁর কাছ থেকে একফোঁটা সহানুভূতি পাননি, বড় নিষ্ঠুর কঠিন উনি।

–জেমস বেন্টলী তাহলে তোমার মতে খুনী প্রকৃতির নয়?

–আমি তো ভাবতেই পারিনি ওকে পুলিশ ধরবে।

হয়ত পোয়ারো পারবেন প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করতে।

-হ্যাঁ, হয়ত উনি তা পারবেন। ডীডার চলে যাবার পর মিসেস এরিয়েন অলিভার তার নোটবই খুলে লিখলেন, ডীডার হেণ্ডারসন নয়। শেষের নয়কথাটির নিচে দাগ দিলেন এত জোরে যে ভেঙে গেল পেনসিলটা। বাড়ি ফেরার পথে এরিয়েনের সাথে রবিন ও একজন সুন্দরী তরুণীর দেখা হয়ে গেল।

রবিন বলল, এই ভদ্রমহিলা হলেন বিখ্যাত এরিয়েন অলিভার। এত দয়ালু ধরনের এর চেহারাটা যে বোঝাই যায় না ইনি রহস্য গল্প লেখেন। আর ইভ কার্পেন্টার ইনি। আমাদের পরবর্তী লোকসভার সদস্য এর স্বামী। যিনি বর্তমানে নির্বাচিত সদস্য আছেন তিনি একটি বুড়ো ভাম।

ইভ বলল, অনেক সময় তুমি বড় বাজে কথা বল। দলবিরোধী এসব কথা।

–তাতে কি? আমি তো নির্দলীয়। এরিয়েন ইভ আজ সন্ধেবেলা আমাদের সঙ্গে গল্প করতে চায়। এখানে আপনার আসা উপলক্ষ্যে খুশী হয়ে অয়োজন করেছি একটা ছোট্ট পার্টির বরং আপনি পরের বইটা আমাদের লিখুন এই ব্রডহিনির পটভূমিকায়।

-হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিখুন। ইভ বলল। রবিন বলল, একবার স্তেনজারসনকে এখানে আনুন। যাকগে, মিঃ পোয়ারোকে আমরা নিমন্ত্রণ করতে যাচ্ছি। ইভ বলছিল, ও কাল ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব রূঢ় ব্যবহার করেছে, তাই ক্ষমা চাওয়া দরকার। কিন্তু আপনি সত্যি পরের বইতে এ জায়গার সম্বন্ধে লিখবেন।

-হা মিসেস অলিভার। রবিন বলল, খুনী হবে কে আর কাকেই বা খুন করা হবে?

মিসেস অলিভার জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে মিসেস ম্যাগিনটির জায়গায় কে এসেছে বর্তমানে?

-না না, ও ধরনের নয় বরং খুনের জন্য ইভকে নির্বাচন করুন। ওর বেশ নিজের গলায় নিজের মোজাতেই ফঁস আটকিয়ে মৃত্যু হবে।

-না রবিন আমি না, বরং তুমি খুন হও। গ্রামের কুটিরে তরুণ নাট্যকারকে হত্যা।

রবিন বলল, কে হবে হত্যাকারী?

আমার মা হতে পারেন। হুইল চেয়ারে বসে খুন করলে পায়ের ছাপ থাকবে না।

–ইভ বলল তোমার মা তো আর খুন করতে পারেন না তোমাকে।

–না, তা পারেন না। তবে ধর তোমাকে যদি খুন করেন!

-না, তোমাকে খুন করা হোক আর বরং মিস হেণ্ডারসন হল খুনী তাকে কেউ কোনোদিন খুনী ভাবতেই পারবে না।

রবিন বলল, দেখুন এরিয়েন আপনার বইয়ের প্লট মজুত। ও বাবা, কি ভয়ংকর মরিনের কুকুরগুলো।

দুটো আইরিশ নেকড়ে কুকুর ছুটে আসছে চেঁচাতে চেঁচাতে সকলে তাকিয়ে দেখলেন। একটা বালতি হাতে বেরিয়ে এল মরিন। ডাক দিল কুকুরদের, ফ্লিন, করমিক, এদিকে এস। ও আপনারা, এতক্ষণ শুয়োরগুলোর ঘর আমি পরিষ্কার করছিলাম।

রবিন বলল, তা জানি আমরা। সেই গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে তোমার গায়ে। তা কেমন আছে শুয়োরগুলো?

ওদের নিয়ে আমরা কাল খুব ভয়ে ছিলাম। কিছু খেতে চায়নি। তবে ভালোই আছে আজ। জনিকে তো আজ প্রায় গুঁড়িয়ে ফেলেছিল।

রবিন বলল, তোমরা কি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ জীবনযাপন করছ।

–জনিকে নিয়ে তুমি আজ সন্ধ্যেবেলার পার্টিতে আসছ তো, জিজ্ঞাসা করল ইভ।

–হ্যাঁ।

–আলাপ করতে চাও মিসেস অলিভারের সাথে? ইনিই মিসেস অলিভার।

–নমস্কার। একটা নাটক নিয়েছেন না আপনি আর রবিন একসঙ্গে?

–চমৎকার এগোচ্ছে কাজটা, রবিন বলল, জানেন এরিয়েন, চরিত্রগুলো কিভাবে বন্টন করলে ভালো হয় তা নিয়ে আমি ভেবেছি আপনি বেরোবার পরই।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস অলিভার। –ও চরিত্র বন্টন রবিন বলল, সিসিল লীচকে খুব মানাবে এরিকের চরিত্রে, এখন ও নিটলরেপ এ অভিনয় করছে। গিয়ে দেখে আমার একদিন।

ইভ বলল, মরিন, আমরা তোমার পেয়িংগেস্টকেও নিমন্ত্রণ করব। কোথায় উনি?

–ঠিক আছে। আমরা ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

–না ওঁকে আমি নিজে করতে চাই। কারণ ওঁর সঙ্গে রূঢ়ভাবে আমি কথা বলেছিলাম।

-বোধহয় বাগানেই আছেন উনি। করমিক, ফ্লিন, কি হচ্ছেটা কি? মরিন বালতি ফেলে ছুটে গেল পুকুরের দিকে। ঐ পুকুরের দিক থেকে হাঁসেদের কোলাহল ভেসে এল কানে।

.

১৩.

পার্টি প্রায় শেষ হবার মুখে। হাতে পানীয় নিয়ে মিসেস অলিভার এগিয়ে গেলেন পোয়ারোর দিকে। এতক্ষণ সান্ধ্য সমাবেশে তাদের দুজনকে ঘিরেই মাতামাতি হচ্ছিল। সচরাচর হয়, পরিচিতেরা পাড়ার কেচ্ছা, নানা রকম স্থানীয় তথ্য সরবরাহ করা শুরু করলেন নিজেদের মধ্যে।

এই সুযোগে পোয়ারো এবং মিসেস অলিভার নিজেদের মধ্যে নিশ্চিন্তে কথা বলার সুযোগ পেলেন। ওঁরা কথা বলতে বলতে বাইরে বাগানে বেরিয়ে এলেন।

একটা কাগজ ছিল মিসেস অলিভারের হাতে। চুপিচুপি উনি সেটা গুঁজে দিলেন পোয়ারোর হাতে। সেটা পোয়ারো খুলে দেখলেন। তাতে ডঃ রেগুল লেখা আছে।

মিসেস অলিভারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই উনি বললেন, ডঃ রেগুলই খুনী।

–জানলেন কি করে?

–ওঁর ধরন দেখে।

–হতে পারে কিন্তু খুনের কারণটা কি?

–পেশাসুলভ আচরণের অভাব। সেটা বুঝতে পেরেছিলেন মিসেস ম্যাগিনটি। কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন, খুনী উনিই।

–জানেন, কিলচেস্টার স্টেশনে কাল রাত্রে কেউ আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে চেষ্টা করেছিল রেল লাইনের ওপর ফেলে দিতে।

-হে ভগবান! মানে আপনাকে খুন করার মতলবে?

–হ্যাঁ, আমার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

–ডঃ রেগুল কিন্তু বাইরে গিয়েছিলেন রুগীর কল পেয়ে কাল রাত্রে, আমি সে খবর . জানি।

-হ্যাঁ, উনি কাল রাত্রে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন।

–তা হলে তো খুনী উনিই।

–নাও হতে পারেন কাল রাত্রে কার্পেন্টার দম্পতিও কিচেষ্টারে ছিলেন। কিন্তু একসঙ্গে না এসে আলাদা আলাদা ভাবে ওঁরা বাড়ি ফিরছিলেন। মিসেস রেগুল বলেছেন কাল সারাদিন উনি বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু সে কথার নিশ্চয়তা কি? মাঝে মাঝে মিস হেণ্ডারসনও সিনেমা দেখতে যান কিলচেস্টার-এ।

-কাল রাত্রে মিস হেণ্ডারসন যায়নি, বাড়িতে ছিল। আমাকে ও বলেছে।

–আপনার বিশ্বাস করা উচিত নয় সকলের কথা। কাল রাত্রে ওদের পরিচারিকা ফিজা সিনেমায় গিয়েছিল। তাই বাড়ির কেউ বাইরে গিয়ে থাকলে ওর তো জানতে পারার কথা নয়।

ঐ ব্যাপারটা স্টেশনে কটা আন্দাজ ঘটেছিল?

–নটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিটে। আমরা, মানে আমি, রবিন আর তার মা, তাস খেলছি রাত আটটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত।

–হয়ত আপনি আর রবিন দুজনেই খেলাতে মেতেছিলেন বড্ড বেশি।

–আর মিসেস আপওয়ার্ড আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে বাইরে গিয়েছিলেন। আপনি না মঁসিয়ে পোয়ারো পাগল হলে না আমাদের চোখের সামনে উনি বরাবর ছিলেন। আপনি বোধহয় স্বপ্ন দেখছেন। যদি মিঃ স্পেন্সের মুখে এখন বিরাট কালো একজোড়া গোঁফ লাগিয়ে বলা হয় ইনিই মঁসিয়ে পোয়ারো তাহলে যা হয়, আপনার কল্পনাও ঠিক তেমনই অবাস্তব। কোনো কারণে বোধ হয় আপনি শারীরিক বা মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

–হ্যাঁ হয়েছি মরিন সামারহেসের রান্না খেয়ে। শুধু যে খেয়ে তাই নয়, নানা জিনিস দেখেও। সর্বত্র ফাটল দেওয়ালে, ঠান্ডা হাওয়া, পেটের গণ্ডগোল, বেড়াল, লোমওয়ালা কুকুর, হাতলভাঙা পায়াভাঙা চেয়ার, আমার বিছানা-বড্ড পীড়াদায়ক এ সবই। বাথরুমের কল, ফুটো কার্পেট, বাজে কফি–এ সমস্তই যে কি খারাপ, বিশ্বাস করা যায় না, না দেখলে।

-ওঃ। কিন্তু সত্যিই মরিন সামারহেস সরল প্রকৃতির মহিলা।

–হ্যাঁ, বড্ড ভালো মানুষ। আমাকে সেটাই আরও গোলমালে ফেলেছে।

–ওই যে, এদিকেই আসছেন দেখছি উনি।

একটা গ্লাস মরিনের হাতে ধরা। পোয়ারো আর এরিয়েনকে দেখতে পেয়ে স্নিগ্ধ হাসি হাসলেন। বললেন, আমার কিন্তু অল্প নেশা হয়েছে। আমি পার্টি ভালোবাসি। এখানে আমাদের এসব বড় একটা হয় না। এটা আজ হচ্ছে আপনাদের আসা উপলক্ষে।

আপনারা কত বিখ্যাত। ইস, যদি–আমিও বই লিখতে পারতাম। আসলে মুশকিল হল কোনো কাজই আমি নিখুঁতভাবে করতে পারি না।

–একজন আদর্শ স্ত্রী এবং মা আপনি, পোয়ারো তাকে বললেন।

চোখ দুটি মরিনের বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল চোখ তার বড় সুন্দর। আন্দাজ করলেন মিসেস অলিভার মরিনের বয়েস ত্রিশের সামান্য ওপরে।

মরিন বললেন, সত্যি? যদিও আমি স্বামী আর সন্তানদের সকলকে ভীষণ ভালোবাসি কিন্তু যথেষ্ট কি সেটাই?

পোয়ারো বললেন, দেখুন, আমার মনে হয় যে সত্যি স্ত্রী তার স্বামীকে ভালোবাসেন, তাঁর উচিত স্বামীর পেটের প্রতি যত্ন নেওয়া।

-কিন্তু পেট তো জনির খুব ভালো, একেবারে চর্বি নেই। বলতে পারেন ওর পেটই নেই। অবাক হয়ে মরিন বললেন।

–না, না। খাবারদাবারের কথা আমি বলছি।

–ও বুঝেছি। আমার রান্নাবান্নার কথা আপনি বলতে চাইছেন। আমি আবার খাবারটাবারের ব্যাপারেও একেবারে চিন্তাই করি না। পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও তাই।

মরিন দু-চার মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। অল্প নেশাগ্রস্ত চোখে যেন তাকিয়ে আছেন দূরে। হঠাৎ কথা বলতে শুরু করলেন আবার।

একটা চিঠি পড়ছিলাম সেদিন কাগজে। কেমন বোকা বোকা লাগল চিঠিটা। যদি বাচ্চাকে মানুষ করতে বাবামায়ের অসুবিধে থাকে অথচ দত্তক দিলে সেই বাচ্চার মানুষ হওয়ার সবরকম সুযোগ পাবার সম্ভাবনা ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা তবে দত্তক দেওয়া উচিত কি অনুচিত সেই সম্বন্ধে চিঠিতে আলোচনা করা হয়েছে। মনে হয় আমার এটা বাড়াবাড়ি। আমার মতে সবচেয়ে বেশি দরকার পেট ভরে বাচ্চাকে খেতে দেওয়া। তা পারলেই মিটে গেল সমস্যা।

শূন্য গ্লাসের দিকে মুখ নিচু করে তাকিয়ে মরিন মৃদুস্বরে বলে চললেন, একজনের দত্তক কন্যা ছিলাম আমি। আমায় আমার মা ত্যাগ করা সত্ত্বেও সমস্ত সুবিধে পেয়েছি আমি, তবু এখনো ভাবলে আমার কষ্ট হয় যে, আমার মায়ের কাছে আমি বঞ্চিত ছিলাম না।

-হয়ত সেটা আপনারই মঙ্গলের জন্য করা হয়েছিল। পোয়ারো বললেন।

মরিন পোয়ারোর চোখে চোখ রেখে বললেন, আমার কিন্তু তা মোটেই মনে হয় না। অবশ্য সমাজের কাছে এরকম জবাবদিহি করা সোজা। যাদের সন্তানকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয় না, তারাই এরকম করতে পারে। আমিও মা, আমি কিন্তু জগতের সমস্ত সম্পদের বিনিময়েও কাছছাড়া করতে পারব না আমার সন্তানদের।

–আপনাকে সর্বান্তকরণে আমরা সমর্থন করি। পোয়ারো এবং মিসেস অলিভার দুজনেই একথা বললেন মরিনকে।

রবিন ইতিমধ্যে এগিয়ে এল। আপনাদের কি কথা হচ্ছে?

মরিন বলল, দত্তক নেওয়া সম্বন্ধে। আমার ভালো লাগে না নিজেকে দত্তক ভাবতে। তোমার লাগে?

রবিন বলল, কারও দত্তক সন্তান হওয়া নিশ্চয়ই ভালো অনাথ হওয়ার থেকে। যাকগে, এবার যাওয়া যাক চল।

সবাই উঠলেন অতিথিরা এর মধ্যেই ডঃ রেগুল চলে গিয়েছেন। ঢালু পথ ধরে সকলে এগোতে শুরু করলেন।

রবিন ল্যাবারলাম-এর গেটে পৌঁছতে বলে উঠল, একটু ভেতরে চলুন আপনারা, মাকে বলে যাবেন। উনি বড় অসহায় অথচ আনন্দ পেতে চান সাবইকে নিয়ে।

সবাই হৈ হৈ করে ভেতরে ঢুকল। ওদের সকলকে দেখে মিসেস আপওয়ার্ড খুশী হলেন বলে মনে হল।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, আর কেউ এসেছিলেন, ওয়েদারবি পরিবারের ওরা?

-না, শরীরটা মিসেস ওয়েদারবির ভালো না থাকায় উনি আসেননি। তাই ওঁর মেয়েও আসেননি।

–একটু সংবেদনশীল মেয়েটি, না? শেলা রেগুল বললেন।

–একটু নয়। খুবই বেশি মনে হয় আমার। রবিন মন্তব্য করল।

–সেজন্য নিজেই মেয়েটির মা দায়ী। অনেক মা আছেন, এইভাবে যারা ছেলেমেয়ের মাথাটি খাচ্ছেন। হঠাৎ কথাটা বলে ফেলেই মরিন লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন।

–রবিন, তোমার মাথাটি কি আমি খাচ্ছি? মিসেস আপওয়ার্ড জিজ্ঞেস করলেন।

–এ কি বলছ মামনি? তোমার কথাই হচ্ছে না।

অপ্রস্তুত হয়ে মরিন কথার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। নিজের আইরিশ উলফ হাউণ্ডের বাচ্চার প্রসঙ্গ তুললেন উনি।

–মানুষ কুকুরদের মত বংশ পরম্পরায় পিতৃপুরুষের গুণ পায়। মিসেস আপওয়ার্ড সুনিশ্চিত ধারণা ব্যক্ত করলেন।

আমতা আমতা করে শেলা বললেন, এটা কি ঠিক? মনে হয় আমার পরিবেশও দায়ী তাতে অনেকটা।

–না বৎসে। যদি পরিবেশের প্রভাব কিছু থাকে, তবে তা ওপর ওপর। কেন মানুষ হবে তা বোঝা যাবে না তার বংশ পরিচয়েই।

অহেতুক শেলা জোর গলায় বললেন, খুব অন্যায় এটা। মানুষের বিচার করা ঠিক নয়। এভাবে। একটু লাল দেখালো শেলার মুখ।

কৌতূহল ভরে পোয়ারো শেলার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখলেন।

–জীবনটাই তো অন্যায়ে গড়া, শোনা গেল লরার কথা।

ধীরে ধীরে জনি সামারহেস বললেন, মিসেস আপওয়ার্ডের কথা আমি সমর্থন করি। মানুষের বংশধারার ধাত ব্যাপারটা খুব মানি আমি।

প্রশ্ন করলেন মিসেস অলিভার, আপনার কি মনে হয় সব গুণাগুণই মানুষের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায়, তিন চার পুরুষ পরেও?

মরিন তার স্বাভাবিক সুমিষ্ট স্বরে বললেন, কিন্তু প্রবাদ আছে, যত খারাপই হোক না কেন একজন তাকে করুণা করা উচিত।

ক্রমেই বিষয়বস্তু গভীরতার দিকে এগোচ্ছে দেখে সকলে প্রসঙ্গান্তরে গেলেন। পোয়ারোকে লক্ষ্য করে বলা হল, এবার আপনি বরং মিসেস ম্যাগিনটির হত্যার ব্যাপারে কিছু বলুন। কেন ওই পেয়িংগেস্টকে আপনার খুনী বলে মনে হয় না?

রবিন বলল, জানেন, রাস্তায় পায়চারী করবার সময় ওই লোকটা নিজের মনে বকবক করত। আমি প্রায়ই ওকে দেখতাম। কেমন যেন অদ্ভুত।

-ও যে খুন করেনি তার স্বপক্ষে আপনি নিশ্চয়ই কোনো প্রমাণ পেয়েছেন। একটু খুলে বলুন দয়া করে।

পোয়ারোকে সবাই ধরে বসল। পেয়ারো মৃদু হেসে গোঁফে হাত বোলাতে লাগলেন। বললেন, ও না করে থাকলে খুনটা কে করেছে?

-হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলুন আপনি। ও না করে থাকলে খুন করেছে কে?

লরা আপওয়ার্ড নীরস স্বরে বললেন, আপনাদের প্রশ্নে উনি কি রকম বিব্রতবোধ করছেন। আমাদের মধ্যে হয়ত কোনো একজনকেই খুনী বলে উনি সন্দেহ করেন।

ওরে বাবা আমাদের কেউ। চেঁচিয়ে উঠল সকলে।

মিসেস আপওয়ার্ডের চোখাচোখি হল পোয়ারোর সঙ্গে, ভদ্রমহিলার চোখে কৌতুক ছাড়া আরও কিছু ছিল কি? চ্যালেঞ্জ?

রবিন যেন মজার স্বরে বলল, আমাদের মধ্যে কাউকে? বাঃ মন্দ নয় তা। আচ্ছা মরিন, বল দেখি এবার তুমি সেদিন কোথায় ছিলে?

পোয়ারো তারিখটা মনে করিয়ে দিলেন-বাইশে নভেম্বর রাত্রে।

–তা তো মনে নেই আমার। মরিন বললে।

–এতদিন বাদে সঠিক ভাবে তা কেউই মনে করতে পারে না। সমর্থন জানালো শেলা।

রবিন বলল, মনে আছে আমার। আমি সেদিন কোলপোর্ট থিয়েটারে ব্যস্ত ছিলাম নাটক নিয়ে আলোচনায়। সেই আলোচনা চলছিল বহুক্ষণ। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল

গলসওয়ার্দির নাটক সিলভারবক্স-এর পরিচারিকার চরিত্র। মিসেস ম্যাগিনটির মৃত্যুসংবাদ পরদিন বারবার আমাকে নাটকের ঐ চরিত্রটার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

-হ্যাঁ, হা, মনে পড়ছে আমারও, শেলা বললেন। তুমি সেদিন বলেছিলে একা থাকবেন তোমার মা কারণ সে রাত্রে জ্যানেট বাড়ি থাকবে না। তাই আমি রাত্রের খাওয়া সেরে ওঁকে খানিক সঙ্গ দিতে এসেছিলাম। যদিও ডেকে ডেকে কোনো সাড়া পায়নি ওর।

লরা খানিকটা ভেবে নিয়ে বললেন, সেদিন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল বলে। আমার আবার ঘরটা পেছনে, বাগানের দিকে।

আবার শুরু হল শেলার কথা।

খুন হবার কথা পরদিন জানতে পেরে আমার কেমন ভয় ভয় করছিল। এমন তো হতে পারে যে আমি রাস্তায় হত্যাকারীকে দেখেছি।

-এখনো আমার মনে পড়ছে না যে, আমি ঠিক কি কি করেছিলাম সেদিন। বলে চললেন মরিন, রুটিওয়ালা পরদিন সকালে আমাকে বলছিল মিসেস ম্যাগিনটির একটা কিছু হয়েছে। তার আগে দেরি দেখে যথারীতি ভাবছিলাম উনি কাজে আসছেন না কেন? উঃ কি সাংঘাতিক। প্রায় শিউরে উঠল মরিন।

তখনো লরার চোখ পোয়ারোর মুখের পর।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

নিজের মনে পোয়ারো ভাবছিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ভদ্রমহিলা, নির্মম প্রকৃতির এবং স্বার্থপরও। কোনো কিছু করতে বসলে তা দৃঢ়তার সঙ্গে করার মত ওর মনের জোর আছে।

শেলা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো সূত্র পেয়েছেন আপনি?

উৎসাহিত হলেন জনি সামারহেস-হা, ঠিক। কোনো সূত্র? এটাই তো গোয়েন্দা গল্পে আসল। একমাত্র গোয়েন্দা ছাড়া সূত্র থেকে আসল তথ্য আর কেউ উদ্ধার করতে পারে না।মশাই বলুন না যে কোনো একটা সূত্র, যা জেনেছেন আপনি।

হাসিমুখে সকলে পোয়ারোর দিকে তাকালেন তাদের কাছে এটা যেন অনেকটা মজার ব্যাপার (নিশ্চয়ই হত্যাকারী তা ভাবছে না)। কিন্তু আসলে এটা তো আর মজার ব্যাপার নয়। বড় ভয়ংকর জিনিস হত্যা।

পোয়ারো হঠাৎ পকেট থেকে সেই চারখানা ফটো বের করে রাখলেন টেবিলের ওপর। সূত্র চাইছিলেন আপনারা তাই না? এই সেই সূত্র। তিনি নাটকীয়ভাবে বললেন, একসঙ্গে সবাই টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য শোনা গেল।

–দেখ দেখ।

–কি বিশ্রী ফটো।

—টুপিটাও বিশ্রী।

-আরে, গোলাপের ছড়াছড়ি দেখেছ?

–কারা এরা?

–কি বিচ্ছিরি বাচ্চাটা।

–কেমন অদ্ভুত সব কিছুই।

এককালে কিন্তু এই ফটোর ভদ্রমহিলা দেখতে ভালোই ছিলেন।

–কেমন করে এ ফটোগুলো সূত্র হতে পারে?

চারদিক থেকে ঝুঁকে পড়া মুখগুলোর ওপর পোয়ারো নিজের দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কেউ কি আপনারা ফটোর কাউকে চিনতে পারছেন? যে কোনো একজনকেও, সনাক্ত করতে পারছেন?

সনাক্ত?

–বলতে চাইছি আমি, এই ফটোর মত কোনো ফটো বা চেহারা আগে কোথাও দেখেছেন বলে কি কারও মনে হচ্ছে আপনাদের? হা, মিসেস আপওয়ার্ড, কিছু বলবেন আপনি, এই ফটো সম্বন্ধে?

লিলি একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে গ্যাম্বলের ছবিখানার ওপর আঙুল রেখে লরা বললেন, এই ধরনের, ... মনে হচ্ছে যেন কোথায় দেখেছি..... কিন্তু কোথায়?

–আপনি দেখেছেন এরকম ফটো? কবে?

–খুব সম্প্রতি... কিন্তু কোথায়, মনে হচ্ছে যেন কোথায় দেখেছি... কিন্তু কোথায়? মনে করতে পারছি না। কিন্তু নিশ্চিত আমি, এই রকমই ঠিক দেখেছি।

কুঞ্চন দেখা গেল মিসেস অলিভারের কপালে। উঠে দাঁড়িয়ে শেলা বললেন, আমাকে এবার যেতে হবে মিসেস আপওয়ার্ড। আমার ওখানে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। একদিন কিন্তু আসতে হবে।

–নিশ্চয়ই, যদি আমাকে রবিন নিয়ে যেতে পারে।

–নিশ্চয়ই মা, সেটুকু জোর আছে আমার গায়ে। তবে ওয়েদারবিদের বাড়িতে যাবার দিন হঠাৎ পিছলে গিয়েছিলাম, পথে বেশ কাদা ছিল।

–আঃ, বলে লরা হঠাৎ শব্দ করে উঠলেন।

–মামণি কি হল?

–কিছু না, থামলে কেন?

ব্যাপারটা পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠার সময় ঘটেছিল। তোমার হুইল চেয়ারটা প্রথমে পিছলে গেল, তারপর আমি, উঃ ভাবিনি, রক্ষা পাব সে যাত্রা।

হাসতে হাসতে সকলে বিদায় নিলেন। চিন্তান্বিতভাবে পোয়ারো হাঁটা দিলেন। তিনি কি ফটোগুলো দেখিয়ে ভুল করলেন? অনেকর মুখ দিয়েই নেশার ঝোঁকে বেফাঁস কথা কিছু বেরিয়ে যেতে পারে। তিনি যে নাটকীয়ভাবে সকলের সামনে ফটোগুলো বের করে দেখালেন, তার পেছনেও কি ঝোঁক ছিল নেশার? কে জানে।

কি ভেবে আবার তিনি উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করলেন। ভেতরে গেট খুলে ঢুকে আবার বাড়িটাতে ফিরে এলেন। পোয়ারোর কানে এল রবিন আর মিসেস অলিভারের আলোচনা। রবিনই যেন দুজনের মধ্যে বেশি কথা বলছিল।

তিনি ডানদিকের দরজা ঠেলে মিসেস আপওয়ার্ডের ঘরে প্রবেশ করলেন। আর সকলের সাথে খানিক আগেই তিনিও কিছু সময় এ ঘরে কাটিয়ে গেছেন। ফায়ার প্লেসের সামনে ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, চিন্তায় মগ্ন। সামান্য গলা খাকারি দিলেন পোয়ারো। উনি সেই শব্দে সচকিত হয়ে ফিরে তাকালেন।

–ও, আপনি, তাই বলুন। একেবারে আমি চমকে গিয়েছিলাম।

–আমি দুঃখিত। অন্য কাউকে কি আপনি আশা করেছিলেন? সে কে?

লরা এড়িয়ে গেলেন প্রশ্নটা–আপনি কি কিছু ফেলে গেছেন, মিঃ পোয়ারো?

-যা আমি এখানে ফেলে গেছি, তা হল বিপদ। আপনি ফটোটা কার হতে পারে বলে সন্দেহ করেন?

–বিপদ?

-হ্যাঁ, আপনার বিপদ, কারণ আপনি একটা ফটো দেখে কোনো একজনকে চিনতে পেরেছেন। ঠিক যে চিনতে পেরেছেন তা নয়, পুরনো সব ফটোই প্রায় এক ধরনের লাগে।

মাদাম শুনুন, এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া আমাদের উচিত। একটা ফটো দেখে মিসেস ম্যাগিনটিও কাউকে চিনতে পেরেছিলেন এবং তাকে সেজন্য প্রাণ হারাতে হয়।

–কি বলতে চান আপনি? আমার ক্ষেত্রেও মনে হচ্ছে তাই ঘটবে বলে?

-হ্যাঁ। যা জানতে পেরেছেন আপনি, এখনই বলুন। নিরাপদ সময় এটাই। সেটাই শুভ হবে আপনার পক্ষে।

–দেখুন, এত সহজ নয় সব কিছু। আমি তো সঠিক কিছু জানি না। যা আবছা আবছা মনে পড়ে তা ভুলও হতে পারে। কোথায়, কখন, কবে, সবকিছুরই বেশ স্পষ্ট ছবি আসা দরকার মনের সামনে, যা বলছি, বুঝেছেন নিশ্চয়ই?

–কিন্তু মনে হয় আমার খুব ভালোভাবেই জানেন আপনি।

-আপনি আমায় ঘাবড়ে দিতে চান? জানেন, অনেক কিছুই খুঁটিয়ে ভাবা দরকার। ছুটে এসে আমার কাছে কোনো লাভ হল না আপনার। যা জানি আমি তা আমার নিজের

কাছেই জানা থাক। আমি তড়িঘড়ি কোনো সিদ্ধান্ত নিই না। ধীরভাবে এগোই। স্থির সিদ্ধান্তে আসার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু সময় নিতে আমি কার্পণ্য করি না।

-সব কিছু আপনি লুকোতে চান।

–হয়ত ঠিকই বুঝেছেন আপনি। মানুষের শক্তি জানার ক্ষমতাই মানুষকে সেটাই সঠিক পথ নির্দেশ করে। এরকম হালচাল আমাদের দেশের মানুষের বোধহয় পছন্দ হয় না। না, মিঃ পোয়ারো।

বিদেশী বলেই হয়ত আমি, আপনিও আপনার।

–তা কিন্তু আমি বলতে চাইনি যদি রাজী থাকেন আপনি, তবে স্পেন্সকে সুপারিন্টেডেন্ট ভাবা যেতে পারে।

–পুলিশ? না মিঃ পোয়ারো। তার দরকার এক্ষুনি আছে বলে মনে করি না আমি।

পোয়ারো নিরুপায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন।

–আমি আপনাকে সতর্ক করে দিলাম মাত্র। পোয়ারো ফিরে যেতে যেতে নিশ্চিত হলেন যে মিসেস আপওয়ার্ড ফটোখানা সুনিশ্চিতভাবে সনাক্ত করতে পেরেছেন।

শেষ পর্যন্ত বসন্ত এল

১৪.

পোয়ারো সকালবেলা মনে মনে বললেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত বসন্ত এল। তার বিফলে গেছে কালকের রাতটা। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা মিসেস আপওয়ার্ড আর যথেষ্ট সচেতন আত্মরক্ষা সম্বন্ধে। পোয়ারো তার ভাবভঙ্গি কিছুই বুঝতে পারেননি। ভদ্রমহিলা আসলে তাকে বুঝতে দেননি। তিনি চিনতে পেরেছেন গ্যাম্বা র ফটোটা এবং নিজেই সে সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবেন। গতকালের ঘটনাটা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে আগাগোড়া নিজের মনে পোয়ারো বিশ্লেষণ করছিলেন।

হঠাৎ একেবারে ঠিক পেছনে শোনা গেল কারও কণ্ঠস্বর।

-মিঃ পোয়ারো। লঘুপদে মিসেস রেগুল সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মোটেও মিঃ পোয়ারো তাঁর পদশব্দ শুনতে পাননি। বড্ড নার্ভাসবোধ করছেন কাল থেকেই।

ক্ষমা করবেন। আপনি এসেছেন, টের পাইনি আমি একেবারে।

একটু হাসলেন শেলা। তিনি পোয়ারোর থেকে বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। কাঁপছে। চোখের পাতা। অস্থির ভাবে বারবার দুহাত মুঠো করছেন।

নিশ্চয়ই আপনাকে আমি খুব বিরক্ত করছি না? আপনি কি এখন ব্যস্ত?

-না, না, মোটেও ব্যস্ত নই। বসন্তের সৌন্দর্য একটু উপভোগ করছি বাইরে বেড়িয়ে। ভীষণ হওয়া এ বাড়িটায়।

–তা যা বলেছেন।-জানলা কোনো সময় বন্ধ করা যায় না। আর খুলে খুলে যায় দরজাটাও।

-বাজে বাড়িটা। ওঁরা যত্ন নেন না বাড়িটার। অবশ্য সামর্থ্যও নেই সত্যি। তাহলে রাখা কেন বাড়িটা, আমি হলে বিক্রি করে দিতাম এটা। এমন বাজে সেন্টিমেন্টের মানে হয় না কোনো।

–আমরা আজকাল কেউই সংবেদনশীল নই।

–হবে। আড়চোখে পোয়ারো ভদ্রমহিলার অস্থির হাত দুটোর দিকে তাকালেন। শেলাই প্রথম কথা শুরু করেন, মনে মনে তিনি তাই চাইছিলেন।

–আচ্ছা, যখন কোথাও তদন্ত করতে যান আপনি, কেন এসেছেন এখানে? একথার কৈফিয়ত কি আপনাকে দিতে হয় সেখানে?

মহিলার দিকে চোখ না রেখেও পোয়ারো বুঝলেন যে তাকে তীক্ষ্ণভাবে শেলা নিরীক্ষণ করছেন।

পোয়ারো বললেন, হ্যাঁ, বলে নিলে সুবিধে হয় অনেক ক্ষেত্রে।

বড্ড বিরক্তিকর।

–কিন্তু আমার তা মনে হয় না। কাজ এতে বেশ তাড়াতাড়ি এগোয় বলে ধারণা আমার।

–তাহলে এখন বলুন, এখানে কেন মিঃ পোয়ারো আপনি এসেছেন। এই ব্রডহিনিতে?

–সে কারণটা তো আমি আপনাদের বলেছি। মিসেস ম্যাগিনটির খুনের কিনারা করতে এখানে এসেছি।

–আপনি তাই বলছেন বটে কিন্তু তা অবিশ্বাস্য।

–তাই নাকি?

–হ্যাঁ, কে এ কথা বিশ্বাস করে না।

–কিন্তু সত্যি এটাই। একটা কথা বলবেন?

–বলুন।

–আমি উড়োচিঠির সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই।

–বেশ তো।

–সব সময় এগুলো মিথ্যে হয়, তাই না?

–অনেক সময়।

–না সব সময়।

–আমি তা বলতে পারি না।

–এ ধরনের চিঠিগুলো ভীরুতা, বিশ্বাসঘাতকতা আর নিচু মনের লক্ষণ।

–আমি আপনার কথা সমর্থন করি।

নিশ্চয়ই আপনি এগুলোর বিষয়বস্তু বিশ্বাস করেন না?

–খুব কঠিন প্রশ্ন। না। আর আমি একবর্ণও বিশ্বাস করি না এইসব বিষয়ের।

শেলা প্রবলভাবে আপত্তি জানিয়ে হঠাৎ বিদায় নিলেন। ভুরু কুঁচকালেন পোয়ারো।

সব ব্যাপারটাই গোলমেলে। শেলা তার আগমনের কারণ বিশ্বাস করেন না। তার মানে একটা অজুহাত এটা। কিন্তু ভয় দেখানো উড়োচিঠির সম্পর্ক কি এর সঙ্গে? শেলাই কি লরা আপওয়ার্ডের সনাক্ত করা ছবির মানুষ? তাহলে কি শেলা লিলি গ্যাম্বল? লিলির সম্বন্ধে সর্বশেষ খবর সে আয়ার্ল্যাণ্ডে ছিল। তার পরিচয় ছিল একজন স্টেনোগ্রাফার। তবে কি সেই সূত্রেই সেখানে ডাক্তারের সাথে পরিচয় তার? ডাক্তার লিলির অতীত ইতিহাস না জেনে বিবাহ করেছেন তাকে? এ সবই সম্ভাবনার কথা। কিন্তু সত্যি হতেও পারে। হঠাৎ ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করায় পোয়ারো বাড়িতে ঢুকলেন। ইস, তিনি যদি

খুনের হাতিয়ারটা খুঁজে বের করতে পারতেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত তার মনে হল, যেন অস্ত্রটা তিনি কোথাও দেখেছেন। কোথায়?

.

পোয়ারো ভেবে অবাক হচ্ছিলেন কি করে চোখের এত সামনে থেকেও অস্ত্রটা তার নজর এড়িয়ে গিয়েছিল এতদিন আশ্চর্য। বইয়ের আলমারির ওপরেই ওই তো ওটা রাখা আছে। ঠিক জানলার ধারে। লং মিডোস-এ আসার পরই তো ওখানে ওটা তার দেখার কথা। ওখানে আছে গোড়া থেকেই।

হাতে তুলে পোয়ারো পরীক্ষা করলেন। ধার আছে, বেশ ভারীও। বাড়িমারার ভঙ্গি করছেন হাতে তুলে এমন সময় কুকুর দুটোর পেছন পেছন মরিন ঘরে ঢুকলেন, পোয়ারোকে হালকা গলায় বললেন, আপনি কি খেলা করছেন মিঃ পোয়ারো চিনি গুড়োবার যন্ত্রটা নিয়ে?

–এটা বুঝি চিনি গুঁড়োবার যন্ত্র?

-হ্যাঁ, অথবা বলতে পারেন হাতুড়িও, ঠিক আমি জানি না। দেখতে কিন্তু মজার। হাতলে ঐ পাখিটা থাকার জন্য, তাই না?

পোয়ারো যন্ত্রটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলেন–পেতলের তৈরি ভারী বাটালির মত। যথেষ্ট ধার আগায়। হালকা নীল, লাল পাথর বসানো আছে জায়গায় জায়গায়। হাতলে ছোট্ট পাখিটার চোখ দুটো চকচক করছে।

যন্ত্রটা মরিন হাতে নিয়ে তুলে কাউকে মারার মত ভঙ্গি করলেন।

–কাউকে এটা দিয়ে মারা খুব সহজ, না?

পোয়ারো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মরিনের দিকে তাকালেন, শিশুর সরলতা আর কৌতুক মাখানো মরিনের চোখে।

মরিন আবারও বললেন, মস্তিষ্ক পর্যন্ত এটা দিয়ে বিধিয়ে ফেলা যায়, কি বলেন? জনিকে আজই বলছিলাম জীবনে যদি আমার ক্লান্তি আসে তবে এটাই আমার বন্ধুর কাজ করবে।

এবার মরিন হাসতে হাসতে ওটা রেখে দিলেন।

–আমি কেন যেন এঘরে এসেছিলাম? দূর ছাই, মনে পড়ছে না। যাক গে, দেখি হয়ত জল লাগবে আবার পুডিং-এ।

ঘর থেকে মরিন বেরিয়ে যাবার আগেই তাড়িতাড়ি পোয়ারো জিজ্ঞেস করলেন, ভারতবর্ষ থেকে ফেরার সময় বোধহয় এটা নিয়ে এসেছেন?

-না তো। ওটা বি অ্যাণ্ড বি থেকে বড়দিনের সময় কেনা।

–বি অ্যাণ্ড বি? সেটা আবার কি?

-মানে ব্রিং অ্যাণ্ড বাই। অর্থাৎ আপনার কোনো প্রয়োজনে লাগে না এমন জিনিস ওখানে নিয়ে গিয়ে তার বদলে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিলেন। অবশ্য ওখানে সেরকম দরকারী জিনিস অবশ্য কিছু থাকে না। আমি একটা কফি পটও এটার সঙ্গে এনেছিলাম। আসলে আমার পটের নল ও বাটালির হাতলের পাখিটা খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত কফি পটটা বাগদাদ থেকে কেনা, ওয়েদারবিরা সেরকমই বলেছিলেন। অথবা পারস্যের জিনিসও হতে পারে।

-তাহলে ওয়েদারবি পরিবারের সম্পত্তি ছিল এটা?

-হ্যাঁ। এরকম অনেক জিনিস আছে ওদের। যাকগে এবার যাই, দেখতে হবে পুডিংটা। বেশ ছোট কফি পটটা। তামার তৈরি। পটের আকারের তুলনায় বেশি রকম লম্বা নলটা যা পোয়ারোকে কোনো পুরনো কিছু বিষয় মনে করিয়ে দিল যেন।

মরিন বেরিয়ে গেলে বাটালিটা নিয়ে পোয়ারো গেলেন জানলার ধারে। আগার ধারালো মুখটা একটু যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে বলে মনে হল তার। অস্ত্রটা নিয়ে একটু দ্বিধা করে সোজা চলে এলেন নিজের শোবার ঘরে। একটা বাক্সে ওটাকে পুরে সুন্দর করে কাগজ দিয়ে প্যাক করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি নিশ্চিত যে এ জিনিসটার কেউ খোঁজ করবে না কারণ এ বাড়ির জিনিস বড় আগোছালো। মিসেস আপওয়ার্ডের বাড়িতে মিসেস অলিভারের জোর আলোচনা চলছে রবিনের সঙ্গে।

-এরিয়েন, কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না, আপনার গোয়েন্দাকে হঠাৎ আপনি নিরামিষাশী করতে গেলেন কেন।

কি করে বলব? জানি না কেন এরকম অদ্ভুত একটা লোকের কথা আমি ভাবলাম। ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, অথচ ওদেরই একজনকে গোয়েন্দা বানালাম না। যদি একবার পাঠক লেখককে পছন্দ করে ফেলে তখন আর থামা যায় না। আমার তো মনে হয় আমার বইতে যেমন ধরনের খুন হয় আমি তার চেয়ে নিজেই ঢের ভালো খুন করতে পারি। আমার বই তবুও সবাই পছন্দ করে।

–এটা কিন্তু ভালো প্লট হবে। একজন খাঁটি গোয়েন্দা সভেন জারসন কে খুন করলেন আপনি আর আপনার মৃত্যুর পর সেই বই প্রকাশিত হল।

-কিন্তু কি হবে টাকাটার শুনি? খুনের ঘটনা ঘটে গেলেই যে আমার টাকাটা চাই?

–হ্যাঁ, সে ঠিক কথা। তবে এর থেকে বেশি আমি আর কি বলতে পারি? যাতে ভালোভাবে নাটক ওতরায় শুধু সেই চিন্তা রবিনের। অসন্তুষ্ট ভাবে সে মিসেস অলিভারের দিকে তাকাল।

মিসেস অলিভার সেদিন সকালবেলা খুব মনোযোগ দিয়ে চুলে কলপ লাগাচ্ছিলেন। উঁচু কপাল তাঁর, বিশাল চশমা এবং গম্ভীর ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল রবিনের স্কুলের দিদিমণির কথা।

রবিন বলে উঠল, আমার কাজে মন লাগছে না। বরং ঠিক করে ফেলা যাক কাকে কোন চরিত্রে অভিনয় করতে দেওয়া যায়। ডেনিস ক্যালরিকে যদি পাওয়া যায়, ও আবার ব্যস্ত সিনেমা নিয়ে, আর তার সাথে জীন বেলিউসকে তাহলে ভালো হয় সবচেয়ে। আমরা

আজ রাত্রে একবার সিসিলের সঙ্গে দেখা করব। কেমন মানাবে ওকে, ভালো করে একবার খেয়াল করে দেখবেন কিন্তু।

সম্মতি নিয়ে মিসেস অলিভারের টেলিফোনে রবিন সব বন্দোবস্ত করে রাখল।

.

সকালটা দেখে যেমন মনে হয়েছিল সারাদিন আবহাওয়া ভালোই যাবে। তা কার্যক্ষেত্রে হল না। আকাশ খানিক বাদেই মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। বৃষ্টি নামবে মনে হল।

লতা পাতার একগাদা ঝাড় সরিয়ে হান্টাস ক্লোস এ ঢুকতে ঢুকতে মনে হল পোয়ারোর, তার এরকম জায়গায় থাকা পোষায় না। বাড়ি ঘিরে গাছপালা, দেওয়াল থেকে আইভিলতা।

বাপরে বাপ। একটা গাছ কাটার কুঠার সঙ্গে থাকলে ভালো হয়। (কুঠার? চিনি গুঁড়োবার যন্ত্র?) ঐ ধারালো বাটালিটার কথা হঠাৎ মনে পড়ল তার।

ওয়েদরবিদের দরজায় এসে দাঁড়ালেন পোয়ারো। ডীডার বেল শুনে খুলে দিল দরজা।

–আপনি?

–হ্যাঁ, কথা বলতে পারি আপনার সঙ্গে?

নিশ্চয়ই। আসুন।

পোয়ারো বসার ঘরে প্রবেশ করলেন।

মরিনের কেনা কফির পটের মত হুবহু এক রকম কফি পট তাকের ওপর দেখতে পেলেন। এটা অবশ্য একটু বড়। প্রাচ্যদেশীয় আবহাওয়া ঘরের সর্বত্রই।

-একটু ব্যস্ত ছিলাম আমরা। ফ্রিডা, এখানে যে কাজ করত, চলে যাচ্ছে আজ। এক মাস ছিল মোটে। আমার মনে হয় ও যে কাজটা ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছে তার একমাত্র কারণ ও যাকে বিয়ে করবে সে থাকে সেখানে। ঠিকঠাক সব হয়ে যাওয়াতে ও আজই চলে যাচ্ছে।

–এ খুব অন্যায়।

–ঠিক বলেছেন। আমার সৎপিতাও তাই বলছেন। কিন্তু আমার মনে হয় ওর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা। আমাদের কিছু বলার নেই। ও জামাকাপড় গুছোবার সময় দেখে ফেলেছি আমি তাই। নইলে আমাদের না জানিয়েই ও চলে যেত। টেরও পেতাম না কেউ।

-ন্যায়সঙ্গত নয় কাজটা। তবে অত বিবেচনা থাকার কথা নয় এ বয়সে।

–হ্যাঁ। আমি আজ খুব ক্লান্ত।

–দেখে তাই মনে হচ্ছে বটে।

–কি জানতে চান আমার কাছে?

–চিনি গুঁড়ো করবার একটা হাতুড়ি সম্পর্কে।

–চিনি গুঁড়ো করার হাতুড়ি?

-পেতলের তৈরী। একটা পাখি বসানো হাতলে। গোটা জিনিসের গায়ে লাল নীল পাথর আছে।

–ও হা মনে পড়েছে। মিস হেণ্ডারসন নিরুৎসুক স্বরে বলল। বোধহয় ওটা এককালে এ বাড়িতেই ছিল?

–হ্যাঁ। ওটা বাগদাদ থেকে আমার মা কিনেছিলেন। ওটা পরে বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়া হয়।

–ওই ব্রিং অ্যাণ্ড বাই সেলে না?

–হ্যাঁ, ওটা বেশ সুবিধাজনক।

বড়দিনের আগে পর্যন্ত জিনিসটা এখানেই ছিল তাহলে?

–না। ওটা বিক্রি করা হয় ফসল কাটা উৎসবের সময়।

কবে হয় ঐ উৎসব? অক্টোবর না সেপ্টেম্বরে?

সেপ্টেম্বরের শেষে। মিস হেণ্ডারসনের দিকে তাকালেন। ডীডারও তার দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখ তার নির্বিকার, ভাবলেশহীন।

মিস হেণ্ডারসন, আপনি কি নিশ্চিত যে ওটা সেপ্টেম্বরেই বিক্রি করা হয়, বড়দিনে নয়?

নিশ্চিত আমি। ডীডার স্থির নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল।

পোয়ারো আরও কিছু শোনার আশায় ছিলেন। কিন্তু তার পূরণ হল না সে আশা।

–তাহলে এবার উঠি, মাদমোয়াজেল।

তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল ডীডার। যেতে যেতে পোয়ারো ভাবছিলেন কার কথা ঠিক? মরিনের না ভীডারের? অস্ত্রটা ডিসেম্বরের ২৫ তারিখ পর্যন্ত কার জিম্মায় ছিল? বাইশে নভেম্বর খুন হন মিসেস ম্যাগিনটি

পোস্ট অফিসে গেলেন পোয়ারো। মিসেস সুইটিম্যান ছোটখাটো দরকারে তাঁকে চমৎকার সাহায্য করেন। উনি কিন্তু বর্ণনা শুনে অস্ত্রটির কথা মনে করতে পারলেন না। উনিও নিয়মিত ব্রিং অ্যাণ্ড বাই সেলে যান। তবে কফি পটের সাথে একটা কিছু ছিল তা মনে পড়ছে। বোধহয় দাম আন্দাজ পঁচিশ শিলিং। শুধুই ঘর সাজানোর জন্য কফি পট কারণ ওর তলায় একটা ফুটো ছিল। উনি সময়টা সঠিক বলতে পারলেন না কিছুতেই, বড়দিনে না তার আগে।

উনি পোয়ারোর অস্ত্রের প্যাকেটটা রেজিস্ট্রি করার দায়িত্ব নিলেন।

ওঁর চোখে পোয়ারো কৌতূহলের ছোঁয়া লক্ষ্য করলেন।

পোয়ারো ওখান থেকে বেরিয়ে এসে পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলেন।

ডীডার আর মরিনের মধ্যে সরল মরিন। কিন্তু তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। তাই ভুল হবার সম্ভাবনা তার বেশি। আবার একটু অদ্ভুত প্রকৃতির বলে ডীডারের কথাও সম্পূর্ণ ঠিক তাও বলা চলে না। তবে একটা কথা এর মধ্যে থেকেই যাচ্ছে। ডাডারের প্রশ্ন করা উচিত ছিল পোয়ারোকে, কেন তিনি জিজ্ঞাসা করছেন অস্ত্রটার কথা। তার পক্ষে প্রশ্নটা করা খুবই স্বাভাবিক ছিল অথচ সে করেনি।

.

১৫.

মরিন বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই বলল, মিঃ পোয়ারো একটা ফোন এসেছিল আপনার।

-কার বলুন তো?

–তা জানি না তবে লিখে রেখেছি নম্বরটা।

–খুব ভালো। খাবার ঘরে রাখা টেলিফোনের কাছে গিয়ে পোয়ারো নম্বরটা দেখলেন কিলচেস্টার ৩৫০। তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন নাম্বারটা। ওপাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল নারীকণ্ঠ, ব্রিদার অ্যাণ্ড স্কাটল।

চট করে পোয়ারো বললেন, মিস মড উইলিয়ামসের সঙ্গে কি আমি কথা বলতে পারি?

–মিস উইলিয়ামস বলছি।

–আমি এরকুল পোয়ারো। আমায় আপনি ফোন করেছিলেন?

–হ্যাঁ, আমিই। আপনি যে সম্পত্তিটার কথা বলেছিলেন সে সম্বন্ধেই কিছু বলতে চাই।

অবাক হলেন পোয়ারো কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন অন্য লোক ঘরে আছে বলে মডের অসুবিধে আছে খোলাখুলি কথা বলতে।

–বুঝেছি। বেন্টলী ও মিসেস ম্যাগিনটির ব্যাপারে আপনি সাহায্য করতে চান।

–হ্যাঁ। কি করব আমি?

-বেন্টলীর জন্য আপনি আমাকে সাহায্য করতে চান এবং আপনি যেখানে আছেন, তা ওই কাজের পক্ষে নিরাপদ নয়, এই তো?

-হ্যাঁ।

–বুঝেছি। শুনুন সত্যিই আপনি সাহায্য করতে ইচ্ছুক?

–নিশ্চয়ই।

–এই চাকরিটা যদি ছাড়তে হয়?

–তা হলেও।

–গৃহস্থালীর কাজকর্ম কি করবেন আপনি?

–আপত্তি নেই।

–চাকরি এখনি ছেড়ে দিতে পারবেন? আগামী কালই?

–পারব।

–বুঝতে পারছেন কি যে, হয়ত রান্নাও করতে হবে আপনাকে? আপনি রান্না করতে জানেন?

-জানি খুব ভালোই।

–শুনুন তা হলে। আমি এখুনি কিচেষ্টার যাচ্ছি। আপনার সঙ্গে সেই রেস্তোরাঁতেই দেখা করব, অবশ্যই মধ্যাহ্নভোজনের সময়।

-আচ্ছা।

পোয়ারো ফোন নামিয়ে রেখে মনে মনে মড়কে সাধুবাদ দিলেন। তিনি তারপর মিসেস ওয়েদারবিকে ফোন করলেন।

–হ্যালো, মঁসিয়ে পোয়ারো কথা বলছি। চিনতে পারছেন?

–ঠিক বুঝতে পারছি না....

–আমি এরকুল পোয়ারো।

-হা হা, বুঝেছি। চিনতে পারিনি আগে তাই ক্ষমা করবেন। বাড়ির অবস্থা যে কি তা বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে। ঝামেলা চলছে খুব।

–তা আমি জানি। ফোন করছি সেইজন্যই।

–এত অকৃতজ্ঞ হয় এইসব কাজের লোক। আমি অকৃতজ্ঞতা দু চক্ষে দেখতে পারি না।

–আপনাকে আমিও সমর্থন করি। আচ্ছা, আমার পরিচিত একটি মেয়ে এই ধরনের কাজ খুঁজছে। তবে হয়ত সে ট্রেনিং পায়নি। বলেন তো একবার দেখতে পারি।

–আজকাল ট্রেনিং-এ কিছু কাজ হয় না। যাকগে সে রাঁধতে জানে তো?

জানে। তাহলে কি ওকে আপনার কাছে পাঠাবো? মড উইলিয়ামস ওঁর নাম।

–পাঠিয়ে দিন দয়া করে। আপনি যে আমার কত উপকার করলেন। আমার স্বামী সব ব্যাপারে এত নিয়ম মেনে চলেন যে ডীডারকে তুচ্ছ কারণে বকুনি খেয়ে মরতে হচ্ছে।

হঠাৎ কথায় ছেদ পড়ল। বোধহয় ভদ্রমহিলার ঘরে কেউ ঢুকেছে। রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে তার সঙ্গে উনি কথা বলতে লাগলেন। পোয়ারোর কানে অস্পষ্টভাবে কথাগুলো এল : ঐ মিঃ পোয়ারো ফোন করেছেন। উনি ফ্রিডার বদলী হিসেবে এখানে একজনকে কাজ দিতে পারেন। উনি কি সত্যি ভালো লোক। না না, আপত্তি কোরো না আর। আমার মনে হয় আমাদের কপাল ভালো, আর বিদেশী নয় মেয়েটি, ইংরেজ।

মিসেস ওয়েদারবি আবার অজস্র ধন্যবাদ জানালেন পোয়ারোকে।

পোয়ারো রান্নাঘরে ঢুকে মরিনকে বললেন, আমি দুপুরে খাওয়ার সময় থাকতে পারছি না, কিলচেষ্টার যেতে হচ্ছে আমায়।

-তাই বুঝি; যাক, ভালোই হয়েছে। সময়মত উনুন থেকে পুডিংটা নামাতে ভুলে গিয়েছিলাম। কি শক্ত হয়ে গেল। র‍্যাম্পাবেরীর বোতলটা ভেবেছিলাম খুলব। অবশ্য একটু ছাতা পড়ে গেছে তার ওপর, তবে খুব একটা খারাপ হবে না। বিশেষন পেনিসিলিন স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী।

পোড়া পুডিং আর পেনিসিলিনের হাত থেকে দুপুরের খাওয়াটা বাঁচল দেখে পোয়ারো ধন্যবাদ দিলেন ভগবানকে। আজ ব্লু ক্যাট এ ভালো জমবে খাওয়াটা, তিনি বাড়ি থেকে ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এসে হাঁটতে লাগলেন।

.

ল্যাবারনাম এ রবিন আর মিসেস আপওয়ার্ডের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

–রবিন, যখন নাটক নিয়ে তুমি মত্ত থাকো, তোমার অন্য কিছুই মনে থাকে না।

-মা, ভীষণ দুঃখিত আমি। ভুলেই গিয়েছিলাম আমি যে, আজ রাত্রে জ্যানেট বাড়ি থাকবে না।

-কিছু এসে যায় না তার থাকা না থাকাতে।

-হ্যাঁ, এসে যায়। বরং ফোন করে আমি জানিয়ে দিই আজ রাত্রে আমরা না গিয়ে আগামীকাল যাব।

-ও সব কিছু করতে যেও না। আজকে যাবার কথা, যাবে।

–কিন্তু।

–ব্যাস্ ঠিক আছে।

–জ্যানেটকে কি আমি বলব, আজকের বদলে কাল রাত্রে ছুটি নিতে?

–না, ও অপছন্দ করে ওর প্ল্যান ভেস্তে দেওয়াটা।

–মনে হয় আমি বললে ও কিছু মনে করবে না।

–কিছুই করতে হবে না তোমাকে। কিছু বোলো না জ্যানেটকে, আমি ভাবতে চাই না যে কাউকে অসুবিধেয় ফেলে আমার বার্ধক্য, ...কিন্তু মা....

-ঠিক আছে। মিসেস অলিভারকে নিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়। ঠিক করেছি পাড়ার কাউকে গল্প করতে ডেকে নেব আমার সঙ্গে।

কাকে?

–আমার নিজস্ব ব্যাপার সেটা। ব্যাস্ আর কিছু জানতে চেও না।

–শেলাকে আমি ফোন করি?

–ফোন করার কাউকে দরকার হলে আমিই করব। বরং তুমি কফি তৈরি করে রেখে যাও বেরোবার আগে। একটা বাড়তি কাপও রেখো সঙ্গে, যদি কাউকে ডাকি।

.

১৬.

পোয়ারো ব্লু-ক্যাট রেস্তোরাঁয় লাঞ্চে বসে মডকে তার পরবর্তী কাজ সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিলেন বিস্তারিত।

-আপনি কি কি করতে হবে বুঝতে পারলেন তো?

–হা, মিঃ পোয়ারো।

–কোনো গোলমাল হবে না আপনার অফিসে?

–মামী খুব অসুস্থ আমার এই বলে অফিসে আমার নামে একটা টেলিগ্রাম নিজেই করে দিয়েছি আমি।

-খুব ভালো। একটা কথা মনে রাখবেন যে, একজন সুস্থ মস্তিষ্কের খুনী এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে নিরাপদে। কাজেই সাবধান।

–সতর্ক করে দিচ্ছেন আমাকে?

–ঠিক তাই।

–আত্মরক্ষায় আমি সমর্থ।

–তা ঐ টেলিগ্রাম পাঠানো দেখেই বোঝা যায়।

হেসে উঠল মড। প্রশংসার দৃষ্টিতে পোয়ারো এই মেয়েটিকে দেখতে লাগলেন। বিপজ্জনক কাজে ঝুঁকি নেবার মত মেয়েটির যথেষ্ট সাহস আছে।

-কাজটা আমাকে আপনি করতে দিয়েও কিন্তু ভয় দেখাচ্ছেন আবার।

–না, তবে চোখ কান খুলে সব বিষয়ে সতর্ক থাকাই ভালো।

–আমার তো মনে হয় না এটা খুব বিপজ্জনক কাজ।

–অবশ্য এখন পর্যন্ত আমারও মনে হয় না তা, ব্রডহিনিতে আপনি অপরিচিতা তো?

–তাই তো মনে করি আমি।

–আগে কখনো ওখানে গেছেন?

–দু-একবার অফিসের কাজে যেতে হয়েছিল। মাস পাঁচেক আগে।

–কাকে কাকে দেখেছেন? উঠেছিলেন কোথায়?

কারস্টেয়ার্স কিংবা কার্লাইল এ রকম নামের বৃদ্ধা মহিলা সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে ডেকেছিলেন। গেস্ট হাউসে উনি উঠেছিলেন।

–লং মিডোস-এ?

-হা হা। বিশ্রী বাড়িটা একগাদা কুকুর। এখন যেখানে আছেন আপনি তার কাছাকাছিই হবে।

মাথা নাড়লেন পোয়ারো। আপনি কি মিসেস বা মেজর সামারহেসকে দেখেছিলেন?

–হ্যাঁ, মিসেস সামারহেসকে। আমাকে শোবার ঘরে উনিই নিয়ে যান। আবার বিছানায় একটা বেড়াল বসে ছিল।

-উনি কি আপনাকে দেখলে চিনতে পারবেন?

–মনে হয় না। আর পারলেই বা কি? লোকে তো চাকরি বদলায়। তবে আমার মনে হয় না আমাকে সেদিন উনি তেমন লক্ষ্য করেছেন। গলার স্বরে মডের তিক্ততা।

–ব্রডহিনিতে আর কারও সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

–হ্যাঁ, মিঃ বেন্টলীর সঙ্গে। দেখা হয়ে যায় ঘটনাচক্রে।

না, ঠিক তা নয়, একটা চিঠিতে ওঁকে জানাই যে ওখানে আমি যাচ্ছি, উনি দেখা করতে পারবেন কি না। আমরা কোনো রেস্তোরাঁ বা সিনেমাতে যাইনি। শুধু ফেরার পথে যখন বাসস্টপে অপেক্ষা করছিলাম বাসের জন্য, দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছিল খানিকক্ষণ।

–সেটা কি মিসেস ম্যাগিনটির মৃত্যুর আগে?

–হ্যাঁ, তবে খুব বেশিদিন আগে নয়।

–বেন্টলী কি ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন?

–না।

–আপনি সেদিন আর কারও সঙ্গে কথা বলেননি?

রেডিওতে রবিন আপওয়ার্ডের গলার স্বর শোনা যাচ্ছিল। সেখানে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াতে ওঁর অটোগ্রাফ নিয়েছিলাম।

-উনি দিলেন?

-হ্যাঁ, তবে আমার কাছে কোনো নোটবই না থাকায় একটা যেমন তেমন কাগজে সই করে দেন।

–আর কারও মুখ চেনেন ওখানকার?

-হ্যাঁ, কার্পেন্টারদের। ওঁরা কিচেষ্টারে প্রায়ই আসেন। ওদের গাড়িটা খুব সুন্দর আর ভদ্রমহিলার পোশাকও। বোধহয় লোকসভার ভাবী সদস্য ভদ্রলোক।

–হ্যাঁ।

এবার পকেট থেকে পোয়ারো কতকগুলো ফটো বের করে টেবিলে রাখলেন।

–এদের মধ্যে চিনতে পারেন কাউকে? কি হল?

হঠাৎ যেন মডের মধ্যে একটু সচকিত ভাব দেখলেন তিনি।

-ভদ্রলোক, এইমাত্র যিনি বেরিয়ে গেলেন, ইনি মিঃ স্কাটল। দেখতে পাননি আমাকে। আমাকে এখানে আপনার সাথে দেখলে একটু অদ্ভুত হত ব্যাপারটা। জানেন তো, খুব আলোচনা হয় আপনাকে নিয়ে। আপনি নাকি ফরাসী?

-না, বেলজিয়ান। অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না। এখন বলুন আপনার কি মনে হয়। ফটোগুলো দেখে?

-খুব পুরনো ধাঁচের। সবচেয়ে পুরনোটা ত্রিশ বছর আগেকার।

ভীষণ বোকা বোকা, পুরনো আমলের পোশাক। এই পোশাকে ভদ্রমহিলাদের বিশ্রী দেখাচ্ছে।

–এদের কাউকে দেখেছেন আপনি?

সনাক্ত করতে বলছেন এদের, না এদের ছবি আর কোথাও দেখেছি কিনা জানতে চাইছেন?

–দুটোই।

–মনে হয় কোথাও দেখেছি এই ছবিটা (মডের হাতটা জেনিস কোর্টল্যাণ্ডের ছবির ওপর ন্যস্ত হল)। কোনো কাগজে বোধহয়। ঠিক মনে করতে পারছি না। একটু চেনা-চেনা লাগছে এই বাচ্চাটার ছবিও। কিন্তু কোথায় যে দেখেছি।

-এইসব ফটোগুলোই মিসেস ম্যাগিনটি মারা যাবার ঠিক আগের রবিবার সানডে কম্প্যানিয়ন এ ছাপা হয়েছিল।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মতো পোয়ারোর দিকে তাকাল। এই ফটোগুলোর সংগে ঘটনাটার কোনো সম্পর্ক আছে ভাবছেন? আর সেজন্যই আপনি আমায়....

-হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, পোয়ারো এই বলে পকেট থেকে সানডে ক্যানিয়ন কাগজের কাটিংটা পড়তে দিলেন মডকে।

মড পড়া শেষ করে বলল, তাহলে এইসব মহিলাদের ছবি ওগুলো। আর আপনার ওরকম ধারণা তা দেখেই? কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। (সাগ্রহে পোয়ারো মডের দিকে তাকালেন) ....আপনি অনুমান করছেন যে, এদের মধ্যে এক বা একাধিকজন ব্রডহিনিতে আছে এখন?

হয়ত।

-হ্যাঁ। এদের যে কেউ যেখানে খুশি এখন থাকতে পারে। এই ইভা কেনের ছবিটা দেখে মনে হয় তার বয়স এখন মিসেস আপওয়ার্ডের বয়সের সাথে মিলতে পারে।

–প্রায়।

–কিন্তু এ রকম চেহারা বা বয়স তো অনেকেরই হতে পারে।

–তা পারে। আচ্ছা, ক্রেগ মামলার কথা আপনি মনে করতে পারেন?

–পারি। আমি তখন খুবই ছোট ছিলাম। ওই মামলার সঙ্গে অন্যান্য মামলার তুলনা করা হত। আমার তো মনে হয় না এই মামলার কথা কখনো কেউ ভুলবে।

মাথা তুললেন পোয়ারো। তিনি বুঝতে পারলেন না মডের কণ্ঠস্বরে এত তিক্ততা হঠাৎ এল কেন?

.

১৭.

মিসেস অলিভার বুঝে উঠতে পারছিলেন না ঠিক কি করবেন। তরুণ অভিনেতারা ড্রেসিংরুমে মেকআপ তুলতে ব্যস্ত। তাকে সবাই স্বাগত জানাচ্ছে আর খালি বীয়ারের গ্লাস খানিক পরই ভর্তি করে দিচ্ছে।

মিসেস আপওয়ার্ড বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তাদের হাসিমুখে বিদায় জানিয়েছিলেন। রবিনও, মায়ের যাতে অসুবিধে না হয় কোনো রকম, সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। গাড়ি থেকে দু-একবার নেমে দৌড়ে ভেতরে গিয়ে দেখে এসেছিল সব ঠিকঠাক আছে কিনা।

বাড়ি থেকে শেষের বার বেরিয়ে রবিন একগাল হসে বলেছিল, মামণিকে দেখলাম, ফোন করছেন যেন কাকে, কাকে কিছুতেই বললেন না। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি কে সে ব্যক্তি।

মিসেস অলিভার বলেছিলেন; আন্দাজ করতে পারছি আমিও।

-বলুন তো কে?

–এরকুল পোয়ারো।

-ঠিক তাই। আমারও তাই মনে হয়। ওঁর পেট থেকে মা সব কথা ঠিক বের করবেন। মা কখনো নিজের ধ্যানধারণাগুলো আমার কাছে ভাঙতেই চান না, যাক, এরিয়েন, আসুন আমরা বরং একটু আলোচনা করি নাটকটা সম্বন্ধে। আমার মনে হয় সিসিল সম্বন্ধে আপনার মতামতটাই ঠিক। সত্যি, সিসিল লীচকে এরিকের ভূমিকায় একেবারেই মানায় না। মন্দ নয় নাটকটা ঠিকই, তবে এ নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা ক্লান্তিকর।

নিজের মনে রবিন বকবক করে যাচ্ছিল। মিসেস অলিভারেরও ভালো লাগেনি সিসিলকে। তার চেয়ে মাইকেল, যে কিনা এই মুহূর্তে কথা বলছিল তার সঙ্গে, অনেক বেশি প্রাণবন্ত লেগেছে তাকে। একাই মাইকেল অনর্গল অনেক কথা বলে যাচ্ছিল। পিটার নামে একজন টিপ্পনি কাটছিল মাঝে মাঝে।

মাইকেল বলছিল, আমরা খুব খুশী যে, রবিন শেষ পর্যন্ত আসতে পেরেছে, ওর মায়ের যা প্রতিপত্তি, এখনো রবিন মায়ের অনুমতি ছাড়া এক পা বেরোতে পারে না। মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই সব সময় থাকতে হবে। অথচ এত প্রতিভাবান রবিন। মায়ের কথা শুনে নিজের আখের নষ্ট করার মানে হয় কোনো? এ ধরনের মহিলারা ভীষণ একগুয়ে হন, জানেন, অ্যালেক্স রসকসের কি অবস্থা করেছিলেন উনি? এক বছর ধরে মাথায় তুলে ছিলেন ওকে রাশিয়ান মনে করে। অবশ্য এও ঠিক যে ওঁকে আগাগোড়া অ্যালেক্স গুল মেরেছিল। তাহলেই বা কি? যেই উনি জানতে পারলেন ও একজন দর্জির ছেলে, দূর

দূর করে অমনি তাড়িয়ে দিলেন। এত নাক উঁচু ভদ্রমহিলা। অবশ্য অ্যালেক্স বেঁচে গেছে। ভদ্রমহিলা নাকি সাংঘাতিক রেগে যান মাঝে মাঝে।

-এই যে রবিন, আমরা তোমার মায়ের কথা বলছিলাম। উনি আসতে পারলেন না ভেবে এত খারাপ লাগছে। তবে আমরাও খুব খুশী মিসেস অলিভারকে পেয়ে। উনি কি চমৎকার খুনের গল্প লেখেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একজন মিসেস অলিভারের হাত ধরে বারবার তাকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন।

এরপর বাইরে খোলা হাওয়ায় বসে আরও খানিকক্ষণ নাটকের আলোচনা চলল।

মিসেস অলিভার বাড়ি ফেরার পথে খুব ক্লান্তি বোধ করছিলেন। সীটে বসে পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। সামনে কথা বলেই যাচ্ছিল রবিন।

–এরিয়েন, আপনার কি মনে হয় না এভাবে করলে ভালোই হবে জিনিসটা।

–কি?

–চমকে চোখ খুললেন মিসেস অলিভার। এতক্ষণ তিনি কিছু শোনেননি। বাড়ির (নিজের) কথা ভাবছিলেন। বাড়ির ওয়াল পেপার, টাইপরাইটার, কফি, গাদাগাদা আপেল –ওঃ কি আরাম! শান্তিতে বাড়ি ফিরতে পারলে।

রবিন বলল, আপনাকে খুব পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে।

-না, ঠিক তা না। আমি আসলে ঠিক মিশতে পারি না অচেনা মানুষদের সঙ্গে।

–আমি আবার লোকজন খুব পছন্দ করি, আপনি?

দৃঢ়স্বরে মিসেস অলিভার বললেন, না।

–কিন্তু অত সুন্দর করে বইতে লোকচরিত্র বিশ্লেষণ করেন।

–সেটা আলাদা। আমি গাছপালা বেশি ভালোবাসি মানুষের চেয়ে। তাতে অনেক কম চঞ্চলতা।

–লোকজন আমি ভালোবাসি। আমাকে ওরা উৎসাহ দেয়, গাড়ি এসে দাঁড়ালো ল্যাবারনাম এর গেটে।

–ভেতরে চলে যান আপনি, গাড়ি রেখে আসছি আমি।

গাড়ি থেকে নেমে মিসেস অলিভার এগিয়ে গেলেন। রবিন চেঁচিয়ে বলল, খোলাই আছে। দরজা।

খোলাই ছিল দরজা, ভেতরে ঢুকলেন মিসেস অলিভার। আলোগুলো সব নেভানো। মিসেস অলিভার তার গৃহকত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন একটু। হয়ত এও এক ধরনের মিতব্যয়িতা। বড়লোক হলে মিতব্যয়ী হয় আবার।

হলে দামী সেন্টের একটা হালকা গন্ধ পাওয়া গেল। অবাক হলেন মিসেস অলিভার। ভাবলেন, ঠিক বাড়িতে এলাম তো।

তিনি সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন, হলঘর আলোকিত হয়ে উঠল। বসবার ঘরের দরজাটা ফাঁক করা ছিল।

এক জোড়া পা দেখতে পেলেন মিসেস অলিভার।

ওঃ, তাহলে মিসেস আপওয়ার্ড এখনো শুতে যাননি, দেখো কাণ্ড, নাকি চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়লেন। আলো নেভানো বসার ঘরেও। কে জানে কতক্ষণ ধরে ঘুমোচ্ছেন?

মিসেস অলিভার এইসব ভাবতে ভাবতে ঘরের আলোটা জ্বালালেন।

ফিরে এসেছি আমরা, মাঝপথেই কথা থেমে গেল। গলা দিয়ে তার আর শব্দ বেরোল না। বন্ধ হয়ে আসছে গলা, চিৎকারও বের হচ্ছে না। ফিসফিসিয়ে ডাকলেন, রবিন রবিন।

রবিনের পায়ের শব্দ একটু পরেই পাওয়া গেল। শিস দিতে দিতে এগিয়ে আসছে। দৌড়ে গেলেন মিসেস অলিভার। হলেই তিনি মুখোমুখি হলেন রবিনের।

-যেও না ভেতরে। তোমার মা... মারা গেছেন....ওঁকে খুন করা হয়েছে মনে হচ্ছে।

বেশ পাকা হাতের কাজ

১৮.

বেশ পাকা হাতের কাজ। সুপারিন্টেডেন্ট স্পেন্স মন্তব্য করলেন। ওঁর লালচে গ্রাম্য মুখে সুস্পষ্ট রাগের আভাস। এরকুল পোয়ারো এতক্ষণ যেদিকে চুপচাপ বসে ওঁর কথা শুনছিলেন, সেদিকে ফিরে তাকালেন।–খুব পরিচ্ছন্ন আর নিষ্ঠুরভাবে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। সিল্কের স্কার্ফভদ্রমহিলার নিজের স্কার্ফ দিয়েই বোধহয় সারা হয়েছে কাজটা–সেটা উনি সেদিন পরেছিলেন। পরিষ্কার, দ্রুত, তৎপর কাজ। শুনেছি ভারতবর্ষে এই ধরণের ঠগীর ফঁসের প্রচলন ছিল। ক্যারোটিড ধমনীতে চাপ পড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি আত্মরক্ষা করার বা চেঁচাবার কোনো সুযোগই পায় না।

–এ বিষয়ে তার মানে খুনীর জ্ঞান আছে।

হতে পারে। আবার এটা জানা একান্ত প্রয়োজনীয় নয় কাজ হাসিল করার জন্য। এভাবে যদি আক্রমণ করাই উদ্দেশ্য হয়, দু-চারটে বই পড়েই তা জানা যাবে। বিশেষত সেখানে আক্রান্ত ব্যক্তি অসন্দিগ্ধ এবং সেজন্য যথেষ্ট অসতর্ক থাকে আর এক্ষেত্রে ভদ্রমহিলাটি তাই-ই ছিলেন।

ঘাড় নেড়ে পোয়ারো সমর্থন জানালেন। হা–ওঁর পরিচিত কেউ।

–একঘরে ওরা দুজন কফি পান করেন–দুটো কাপ ছিল ওঁর আর অতিথিটির জন্য। সব চিহ্ন রয়ে গিয়েছে এখনো।

–তাহলে একজন মহিলা?

–আপনি তো একজন মহিলার কথাই ভাবছেন?

–ও হা, তাই তো পাচ্ছি দেখছি।

স্পেন্স বললেন, মিসেস আপওয়ার্ড চারখানা ছবির যে একটিকে সনাক্ত করেন তা লিলি গ্যাম্বলের ছবি। সুতরাং এটা ম্যাগিনটি হত্যারই পরবর্তী অধ্যায়।

–ঠিক। একসূত্রে গাথা দুটোই। মনে পড়ে গেল পোয়ারোর মিসেস আপওয়ার্ডের কৌতুকময় হাসিমাখা মুখ, ছড়া কেটে তিনি যখন বলেছিলেন

মিসেস ম্যাগিনটি অক্কা পেলেন। কেমনে তো জানি, হাঁটু ভেঙে, ঘাড় মটকে যেমনি আছি আমি।

মিঃ স্পেন্স বললেন, একটা সুযোগ নিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা, ওঁর ছেলে আর মিসেস অলিভারকে পাঠিয়ে দিয়ে থিয়েটারে। সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা মহিলাটিকে উনি ফোন করে ডাকেন ওঁর সাথে দেখা করার জন্য। মিঃ পোয়ারো ব্যাপারটাকে কি আপনি অনুধাবন করতে পারছেন? নিজেই উনি গোয়েন্দা সাজতে গিয়েছিলেন–

-হ্যাঁ, ওইরকমই কিছু। নিজে যা জানতেন উনি, তা গোপন রেখেছিলেন এবং উনি আরও বেশি জানতে চেয়েছিলেন। স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে উনি যা করতে চলেছেন, সেটা ডেকে আনতে পারে ভয়ংকর বিপদ। সকলে খুনটুনগুলো এত খেলার ছলে দেখে যে, কি

বলব। আদপেই যে এটা খেলা নয়–এ কথা আমি ওঁকে বলেছিলাম। উনি শুনলেন না। পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

-না, ঠিকই বলেছেন আপনি। তা আমরাও বলেছি, যাই হোক, স্পষ্ট ব্যাপারটা। যখন মিসেস অলিভারের সঙ্গে রবিন রওনা হয়েও আবার ফিরে দেখতে আসেন মাকে তখন ওঁর মা সবেমাত্র টেলিফোন করা শেষ করেছেন। তিনি বলেননি ফোন করেছিলেন কাকে। উনি সেটা রহস্য হিসেবেই রাখতে চেয়েছিলেন। রবিন আর মিসেস অলিভার তো ভেবেছিলেন ব্যক্তিটি আপনি।

-তাই হলে তো ভালোই হত। তাহলে কোনো ধারণাই নেই আপনাদের কাকে ফোনটা করা হয়েছিল?

–নাঃ। সবই স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার এখানে, আপনি তো তা জানেন।

–পরিচারিকাটিও সাহায্য করতে পারবে না?

–না। সে প্রায় সাড়ে দশটার সময় ফিরে আসে। তার কাছে একটা খিড়কির দরজার চাবি ছিল। এসে সোজা সে নিজের ঘরে চলে যায় এবং শুয়ে পড়ে। সে বাড়ি অন্ধকার থাকায় ধরেই নেয় যে ঘুমিয়ে পড়েছেন মিসেস আপওয়ার্ড। এবং তখনো অন্যরা ফেরেনি।

আরও যোগ করলেন স্পেন্স, কানে আবার সে কম শোনে আর কি ঘটছে না ঘটছে সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমার তো ধারণা, যতটা সম্ভব ও মেয়েটি বেশি কথা বলে, ততটা সম্ভব কম কাজ করার ধান্দা করে।

–তার মানে ও তেমন বিশ্বাসী না?

–ওহ, তা নয়। ও তো মোটে দু বছর মিসেস আপওয়ার্ডের কাছে আছে।

দরজায় উঁকি দিয়ে একজন কনস্টেবল বলল, স্যার আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন একজন অল্পবয়সী মহিলা। বলছেন, কাল রাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে উনি নাকি আপনাদের কিছু বলবেন। জরুরী ব্যাপারটা।

কাল রাত্রের ব্যাপারে? ভেতরে পাঠিয়ে দাও ওকে।

ডীডার হেণ্ডারসন এল। কেমন ফ্যাকাসে এবং সেই সাথে ওকে যথরীতি একটু অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

সে বলল, আমার মনে হয় আমার আসাটা একান্তই দরকার। আমি নিশ্চয়ই আপনাদের বিরক্ত করছি না?

–না মিস হেণ্ডারসন, একেবারেই না।

উঠে দাঁড়িয়ে মিঃ স্পেন্স চেয়ার এগিয়ে দিলেন। ডীডার স্কুলের বাচ্চা মেয়ের মত চেয়ারে বসলে বেশ উৎসাহ ভরে স্পেন্স বললেন, কাল রাত্রের ব্যাপারে তো? মিসেস আপওয়ার্ড তাই না?

–হ্যাঁ। এটা তো সত্যি যে খুন হয়েছেন উনি? পিওন, রুটিওয়ালা সে কথা সবাই বলছে। অবশ্য মা বলছেন সবটাই গুজব, সত্যি হতে পারে না কখনো...

থেমে গেল ডীডার। এটা আপনার মা সঠিক বলেননি। সত্যি ঘটনাটা। তাহলে আপনি আমাদের কিছু বলতে চান?

-হ্যাঁ। মানে ওখানে যে আমি গিয়েছিলাম।

কিঞ্চিৎ সরকারী অফিসারের সুর স্পেন্সের আচরণে।

-কি, ওখানে আপনি গিয়েছিলেন? ল্যাবারনাম-এ কটার সময়?

-দেখুন সঠিক আমি বলতে পারব না। আমার ধারণা সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে হবে। সম্ভবত নটার কাছাকাছি। মোটমাট খাওয়া দাওয়ার পর। আমাকে উনি ফোন করেছিলেন কিনা।

–আপনাকে মিসেস আপওয়ার্ড টেলিফোন করেছিলেন?

–হ্যাঁ। উনি বলেন যে রবিন আর মিসেস অলিভার কালেনকোয়েত-এ যাচ্ছেন থিয়েটারে। একলাই থাকবেন উনি, আমি যদি গিয়ে ওঁর সঙ্গে কফি পান করি.... মানে একটু সঙ্গ দিই আর কি।

–এবং তাই আপনি সেখানে যান?

–হ্যাঁ।

–এবং কফিও পান করেন ওঁর সঙ্গে বসে?

উীডার বলল, না। ওখানে যাই আমি। ধাক্কা দিই দরজায় কিন্তু কোনো সাড়া পাই না। আমি তখন নিজেই দরজা খুলে হলঘরের মধ্যেই যাই। বড় অন্ধকার ছিল ঘরটা। আর বুঝতেই পারছিলাম না যে, একটুও আলো নেই কেন বসার ঘরে। হতভম্ব হয়ে যাই একেবারে। মিসেস আপওয়ার্ডকে দু-একবার ডেকেও ছিলাম। ভাবলাম সাড়া না পেয়ে হয়ত আমারই কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে।

–আপনার কি ব্যাপারে গণ্ডগোল হতে পারে বলে মনে হয়েছিল?

–আমার মনে হয়েছিল হয়ত উনি শেষ পর্যন্ত থিয়েটারেই চলে গেছেন রবিনদের সঙ্গে।

–আপনাকেই না জানিয়েই?

–অবশ্য সেটা একটু অদ্ভুত। আর কোনো ধারণা হয়নি আপনার?

—আমি পরে ভেবেছিলাম যে ফ্রিডাই হয়ত আসল খবরটা গোলমাল করে ফেলেছিল। ওর তাড়াতাড়ি কাল রাতে ছুটি পাবার কথা থাকায় ও বোধহয় নিজে খুব উত্তেজিত ছিল।

-আপনি তারপর কি করলেন?

চলে এলাম।

–সোজা বাড়ি?

–না। হাঁটলাম একটুক্ষণ। কাল বেশ চমৎকার ছিল আবহাওয়া।

দু-একমুহূর্ত স্পেন্স চুপ করে থাকলেন। উনি মেয়েটির ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তা লক্ষ্য করলেন পোয়ারো। একটুক্ষণ বাদে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, মিস হেণ্ডারসন ধন্যবাদ। একথা আপনি আমাদের জানিয়ে ভালো করেছেন। আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

ডীডারের করমর্দন করলেন তিনি।

ডীডার বলল, আমার আসাই উচিত আমি ভেবেছিলাম। অবশ্য মা চাননি যে আমি আসি।

-তাই বুঝি?

–ঠিকই বলেছেন আপনি। মিস হেণ্ডারসনকে বিদায় জানালেন স্পেন্স। তিনি ফিরে এসে পোয়ারোর দিকে টেবিল চাপড়িয়ে তাকালেন।

–মঁসিয়ে পোয়ারো, কোনো লিপষ্টিক ছিল না ঠোঁটে। কিংবা আজ সকালে হয়ত মেয়েটি লিপষ্টিক ব্যবহারই করেনি।

-না না, আজ সকালে বলে নয়, ও কোনোদিনই ব্যবহার করে না।

–আজকালকার মেয়েদের পক্ষে এটা একটু অস্বাভাবিক, কি বলেন?

–আসলে একটু অদ্ভুত মেয়েটি, বলতে পারেন অপরিণতও।

–এবং কোনো সুগন্ধিও ব্যবহার করেননি, অন্তত টের পায়নি তো আমার নাক, কিন্তু মিসেস অলিভার বলেছিলেন একটা সেন্টের গন্ধ তিনি পেয়েছিলেন, ও বাড়িতে কাল রাত্রে দামী সেন্ট। সেকথাও রবিনও সমর্থন করেছে। সে বলেছে ওটা তার মায়ের ব্যবহৃত সেন্টের গন্ধ নয়।

–সেন্ট ব্যবহার করে না বলেই তো মনে হয় এ মেয়েটি।

–ঠিক তাই আমার মতও। দেখলেই মনে হয় সাবেকী চাল চলনের কোনো স্কুলে হকির খেলার ক্যাপ্টেন কিন্তু বোধহয় বয়স ত্রিশ ছুঁই ছুঁই, কি বলেন?

–হ্যাঁ, তা হবে। কিন্তু সে অনুপাতে পরিণত নয়।

চিন্তা করলেন পোয়ারো এটা কিন্তু বলা যায় না এত সহজেই।

ভুরু কুঁচকে গেল স্পেন্সের। ঠিক কিন্তু মিলছে না। সেন্ট নেই, লিপস্টিক নেই এবং যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়েটির মা। মদ্যপ ছিল লিলির মা এবং মাত্র লিলির ন বছর বয়সেই সে জড়িত নানান ঝামেলায়। এই মেয়েটি সেক্ষেত্রে কি করেই বা লিলি হয়। আবার মিসেস আপওয়ার্ড একে কাল রাত্রে টেলিফোনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, মোটেও ব্যাপারটা সোজা নয়।

কি বলছে ডাক্তারের সাক্ষ্য, সেখানেও বিশেষ কোন সাহায্য পাচ্ছি না। ভদ্রমহিলা মারা যান মোটামুটি আন্দাজ সাড়ে নটা হবে তা সব ডাক্তারই বলছে।

মিস হেণ্ডারসন আসার ঠিক আগেই মারা যান উনি, তাহলে এমনও হতে পারে, হতে পারে অবশ্য যদি সত্যি কথা বলে থাকে মেয়েটি। হয় সে বলছে সত্যি কথা, নয় গভীর জলের মাছ সে, ওকে ওর মা আসতে দিতে চাইছিলেন না। আপনার কি মত সেই ব্যাপারে?

–ঠিক বলা যাচ্ছে না। মা-টি মেয়েকে আসতে নাও দিতে চাইতে পারেন। অকারণ ঝামেলা তিনি অপছন্দ করেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্পেন্স। তার মানে আমরা অকুস্থলে মিস হেণ্ডারসনকে পাচ্ছি, অথবা এমন একজনকে যে, মিস হেণ্ডারসন আসার আগে ওখানে যায়, একজন মহিলা। একজন মহিলা যিনি ব্যবহার করেন লিপষ্টিক আর দামী সেন্ট। নিশ্চয়ই আপনি তদন্ত করবেন? স্পেন্স পোয়ারোকে বললেন, তদন্ত করছি আমি, এই মুহূর্তে অত্যন্ত

সতর্কভাবে। ইভ কার্পেন্টার কাল রাতে কি করছিলেন? গত রাত্রে শেলা রেগুল কোথায় ছিলেন? ওরা নাকি বাড়িতেই ছিলেন মিঃ কার্পেন্টার, অবশ্য যতদূর জানি আমি, একটা রাজনৈতিক সভায় ব্যস্ত ছিলেন।

চিন্তান্বিত গলায় পোয়ারো বললেন, ইভ। তাড়াতাড়ি কি নামের ফ্যাশান বদলায়। আজকাল ইভা নামটা শোনাই যায় না, না? এটা হয়ে গেছে সেকেলে নাম। বরং ইভ নামটা অনেক বেশি আধুনিক।

নিজের চিন্তায় কিন্তু স্পেন্স অটল। বেশ দামী সেন্ট উনি ব্যবহার করতে পারেন। ওঁর সে সঙ্গতি আছে।

আমাদের আরও কিছু জানা দরকার এই মহিলাটির অতীত সম্বন্ধে। কারণ যুদ্ধের সময় থেকে বিধবা এরকম সাজা খুব সাধারণ ব্যাপার। একজন দুঃখী বিধবা সেজে যেখানে সেখানে আপনি সহানুভূতি পেতে পারেন। কেউ কিছু জানতে চাইবে না।

চিনি গুঁড়ো করার হাতুড়ি, আপনি সেটা অস্ত্র সন্দেহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে, আমরাও সন্দেহ করছি ওটাই মিসেস ম্যাগিনটির হত্যার জন্য দায়ী। ডাক্তার বলছেন, এ ধরনের আঘাত করার জন্য খুবই সুবিধাজনক ওটা। ওতে আছে রক্তের দাগও। যদিও ওটা এখন পরিষ্কার করার পর আমাদের হাতে এসেছে তবুও সাধারণ লোক বোঝেই না যে কত সূক্ষ্ম জিনিসও অনুবীক্ষণ যন্ত্রে সহজেই ধরা পড়ে। যা পাওয়া গেছে ওতে তা মানুষেরই রক্ত। আবারও বোধহয় ঘটনায় ওয়েদারবিদের আর ডীডারকে জড়িয়ে ফেলা হল, তাই না?

মিস হেণ্ডারসন কিন্তু জোর দিয়েই বলেছেন যে, ওটাকে ফসল কাটা উৎসব উপলক্ষ্যে একজিবিশনে দেওয়া হয়েছিল বিক্রির জন্য।

–এবং মিসেস সামারহেসও আবার নিশ্চিত যে, বড়দিনের একজিবিশনে ওটা ছিল। কোনোদিনই মিসেস সামারহেস কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত নন। উনি খুব ভালো কিন্তু কোনো বাঁধুনী নেই কাজকর্মে। তবে আমি আপনাকে এটুকু বলতে পারি–আমি লং মিডোস-এ এতদিন আছি, সর্বদাই দরজা, জানলা ও বাড়ি হাট করে ভোলা থাকে। ইচ্ছে করলে যে কেউ কোনো সময়ে ঢুকে যে কোনো জিনিস ওখান থেকে নিয়ে যেতে পারে আবার পরে এসে তা রেখে দিলে লক্ষ্যও করবে না বাড়ির লোক। ধরুন যদি একদিন মহিলা ঐ যন্ত্রটাই না দেখতে পান, ভাববেন স্বামী ওটা খরগোস মারতে বা মাঠ কাটতে নিয়েছেন। আর যদি ওটা দেখতে না পান, স্বামী তবে ভাববেন কুকুরদের জন্য মাংস কাটবেন বলে ওটা নিয়েছেন স্ত্রী। যে যার খুশিমত জিনিস নেয় ও বাড়িতে, কাজ হয়ে গেলে যেখানে খুশি রাখে। কেউ কিছু মনে রাখতে পর্যন্ত পারে না। ও বাড়ির বাসিন্দা হতে হলে আমার তো মশাই মাথা খারাপ হয়ে যেত। ওরা কিন্তু কিছু পরোয়াই করেন না এ সবের।

গম্ভীর সুরে স্পেন্স বললেন, ভালো কথা। ভালো খবর একটাই যে পুরো তদন্ত ভালোভাবে না মিটলে, বেন্টলীর শাস্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা একটা চিঠিও দিয়েছি মন্ত্রীকে। উত্তরে তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় সময় আমাদের তিনি দিয়েছেন।

–আমার মনে হয় একবার বেন্টলীর সঙ্গে দেখা করা দরকার, বিশেষত যখন আমরা কিছুটা এগিয়েছি। পোয়ারো বললেন।

.

বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি জেমস বেন্টলীর। অবশ্য শরীর আগের চেয়ে খারাপই হয়েছে একটু রোগা। হাত নাড়ার ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে কিছুটা অশান্ত। এছাড়া মোটামুটি আগের মতই চুপচাপ নিরাশ।

খুব সাবধানে পোয়ারো কথাবার্তা শুরু করলেন।

-নতুন করে তদন্তের একটা দিক শুরু হয়েছে। আশা জেগেছে যে.....

কোনো আশাই নেই বেন্টলীর মনে। সে বলল, কোনো লাভ নেই। আর নতুন করে কিই বা তদন্ত হবে।

-আপনার বন্ধুরা কিন্তু খুব আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালাচ্ছেন।

–আমার বন্ধুরা, কোনো বন্ধু নেই আমার। কাঁধ ঝাঁকালো বেন্টলী।

–এ আপনি বলতে পারেন না। অন্তত দুজন শুভাকাঙ্খী বন্ধু আছে আপনার।

–দুজন বন্ধু? জানতে ইচ্ছা করছে আমার তারা কে? অবিশ্বাসের সুর বেন্টলীর গলায়।

–প্রথম, সুপারিন্টেন্টে স্পেন্স।

–স্পেন্স? আমার বিরুদ্ধে যে পুলিশ সুপার মামলা সাজিয়েছেন? আপনি হাসালেন।

–না আপনার সৌভাগ্য। যথার্থ বুদ্ধিমান স্পেন্স এবং ন্যায়পরায়ণ। সব ব্যাপারেই উনি সন্দেহমুক্ত হতে চান।

–তা উনি তো নিঃসন্দেহ আমার অপরাধের ব্যাপারে।

–না–সেটাই আশ্চর্য যে নিঃসন্দেহ নন উনি। সেজন্যই তো বলছি আপনার বন্ধু উনি।

ওঃ, সেইরকম বন্ধু, পরবর্তী প্রশ্নের অপেক্ষায় পোয়ারো চুপ করে রইলেন। তিনি জানেন। যে, সাধারণ মানুষের মত বেন্টলীরও কৌতূহল থাকবে। ঠিক হল তার অনুমান।

জিজ্ঞেস করল বেন্টলী, আর অন্য জন?

–মড উইলিয়ামস।

বেন্টলীর মুখে কোনো রেখাপাত হল না। নিস্পৃহভাবে সে বলল, তিনি আবার কে?

–উনি, বিদ্রার অ্যাণ্ড স্কাটল এর অফিসে কাজ করেন।

–ওঃ, সেই মিস উইলিয়ামস?

–হ্যাঁ, তিনিই। কিন্তু এ ব্যাপারে তার মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন?

এমন এক একটা সময় আসে যে, পোয়ারোরও বিরক্তি ধরে যায় বেন্টলীর এই অনাবশ্যক নিরসক্তিতে। তখন তাঁর সত্যি সত্যিই মনে হয় এরকম চরিত্রের ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলেই খুশি হতেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বেন্টলী যতই তাকে রাগিয়ে দেয় তার ব্যবহারে, ততই বেন্টলীকে তার অপরাধী ভাবতে কোথায় যেন দ্বিধা জাগে, মিঃ স্পেন্সের মত। তার মনে হতে থাকে যে কাউকে হত্যা করার ব্যাপারে বেন্টলীর মত মানুষ নিতান্তই নিরাসক্ত। আর, কাউকে হত্যা করতে চাইলেও সেরকম ক্ষমতা বেন্টলীর আছে বলেও তো মনে হয় না। যা বলেছেন স্পেন্স তাতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটাতে যে অন্যতম গুণ তৎপরতা তা একেবারেই বেন্টলীর নেই।

পোয়ারো ফিরে এলেন পুরনো কথায়, পূর্ণ তদন্তের ব্যাপারে মিস উইলিয়ামস খুব উৎসাহী। উনি স্থির নিশ্চিত যে আপনি নির্দোষ।

-আমি তো ভেবে পাচ্ছি না একথা উনি কি করে ধরে নেন?

–কারণ আপনাকে উনি যথেষ্ট জানেন।

চোখ পিটপিট করল বেন্টলী। তারপর একগুঁয়ে ভাবে বলল। হ্যাঁ, হয়ত কিছুটা জানেন। কিন্তু সবটা নয়।

একই অফিসে আপনারা কাজ করতেন, তাই নয় কি? একসঙ্গে কখনো কখনো খেতেও যেতেন।

–ও হা। সে মাত্র একবার কি দুবার। ব্লু-ক্যাট কাফেতে ওই রাস্তাটা পেরোলেই।

–ওর সঙ্গে কি কখনো বেড়াতে যাননি?

–আমরা একসঙ্গে হেঁটেছিলাম একদিন, খানিকক্ষণ।

চেঁচিয়ে উঠলেন পোয়ারো, আপনি মশাই কি? কোনো মহিলার সাথে মিশে কি কোনো অপরাধ করেছেন আপনি নাকি সে সব কথা আপনার পেট থেকে টেনে বার করতে হবে? এটাই তো আপনার বয়সে স্বাভাবিক। আপনার এসব ভালো লাগে না?

–তা কেনই বা লাগতে যাবে?

–কি বলছেন যা তা। এই সবই তো করে আপনার বয়সের ছেলেমেয়েরা।

–বেশি মেয়েকে আমি চিনি না।

–সে কথা হচ্ছে না। কিন্তু আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত। মিস উইলিয়ামসকে আপনি চেনেন, ওঁর সহকর্মী ছিলেন, কথা বলতেন ওঁর সঙ্গে, বেড়াতেও গিয়েছিলেন একবার। ওঁর কথা এসব সত্ত্বেও আমি যখন আপনাকে বললাম, আপনি কিন্তু ওঁকে চিনতেও পারলেন না। এবার লজ্জায় লাল হল বেন্টলী।

–মঁসিয়ে পোয়ারো দেখুন, মেয়েদের সঙ্গে ওভাবে কোনোদিনই আমি মিশিনি। রীতিমাফিক অভিজাত মহিলা বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই ছিলেন মিস উইলিয়ামস।

উনি এমনিতে খুব ভালো সত্যি আমার মনে হয় আমার মায়ের বিচারে উনি খুবই সাধারণ মেয়ের পর্যায়ে পড়তেন।

–ওঁর সঙ্গে মেলামেশা না করার এটাই কি একমাত্র কারণ? আবারও লাল হল বেন্টলী।

— ওঁর চুল, পোশাক কিছুই নয় আমার মায়ের মত। মা খুব সেকেলে ধাঁচের মহিলা।....

বেন্টলী চুপ করে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন পোয়ারো, খুব সহানুভূতিশীল মহিলা মিস উইলিয়ামস। তাই না?

হ্যাঁ, খুব দয়ালু উনি কিন্তু.... অবুঝ একেবারে। বুঝতে চান না সব কথা। খুব ছেলে বেলায় অবশ্য ওঁর মা মারা গেছেন বলে শুনেছি।

–তারপর, চাকরিটি খোয়া যায় আপনার। অন্য চাকরি পাচ্ছিলেন না। ব্রডহিনিতে মিস উইলিয়ামসের সঙ্গে সম্ভবত দেখা হয় আপনার?

হতাশাগ্রস্ত দেখালো বেন্টলীকে।

-ওখানে উনি বৈষয়িক কাজে এসেছিলেন। সে কথা আমায় একটা চিঠিতে জানান। ওঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। কিন্তু কেন, অনেক ভেবে তার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাইনি। ওঁকে আমি বিশেষ ভালোভাবে জানতামও না।

–কিন্তু দেখা করেন আপনি।

–হ্যাঁ, অকারণে অভদ্রতা করতে পারিনি।

–তারপর? আপনি ওঁকে নিয়ে কোথায় গেলেন? সিনেমা না রেস্তোরাঁয়?

–না, মশাই না। দুচার কথা বলেছিলাম বাস স্টপে দাঁড়িয়ে।

–আহা হা, সুন্দরী মেয়েটির কপালে সেদিন অনেক দুর্ভোগ ছিল।

এবার বেন্টলী রেগে গেল। মঁসিয়ে পোয়ারো, কত বার বলব, আমার হাতে সেদিন মোটে টাকা পয়সা ছিল না।

হা হা। আচ্ছা, এটা তো মিসেস ম্যাগিনটি মারা যাবার কয়েকদিন আগের ঘটনা, তাই না?

মাথা নাড়ল বেন্টলী। সে হঠাৎ বলল, হ্যাঁ, সোমবারের ঘটনা এটা। বুধবার মিসেস ম্যাগিনটি মারা যান।

আমি এবার আসছি অন্য প্রসঙ্গে। বলুন তো, মিসেস ম্যাগিনটি কি সানডে কম্প্যানিয়ন পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন?

-হ্যাঁ।

–আপনি কখনো পড়েছেন ঐ কাগজটা?

–পড়েছি। উনি অনেকবারই দিতে চেয়েছেন আমাকে, আমি নিইনি প্রতিবার। আমার মা ঠিক ঐ ধরনের পত্রিকাগুলো পড়তেন না।

–সেই সপ্তাহের পত্রিকাটা তাহলে আপনি পড়েননি?

-না। এবং মিসেস ম্যাগিনটি ওই কাগজ বা কাগজের কোনো খবর নিয়ে আপনাকে কিছু বলেনও নি?

-বলেছিলেন তো। অনেক কথাই বলেছিলেন।

-তাই নাকি? তাহলে অনেক কথা বলেছিলেন। একটু মনে করে কথাগুলো বলুন তো। ব্যাপারটা জরুরী।

-খুব ভালো করে তা এখন আর মনে নেই। কোনো পুরনো দিনের খুনের ঘটনা। বোধহয় ক্রেগ মামলা, আবার নাও হতে পারে। যাকগে, উনি বলেছিলেন যে, ওরকম কোনো পুরনো মামলার সঙ্গে জড়িত কেউ এখন ব্রডহিনিতেই বাস করছেন। অনেক কথা এনিয়ে উনি বলেন। যদিও ভেবে পাইনি আমি ওঁর তাতে মাথা ব্যথাটা কি?

-কি বলেছিলেন উনি, কে জড়িত ব্যক্তিটি?

–মনে হয় নাটক লেখেন যে ভদ্রমহিলাটির ছেলে, সেই মহিলাটি।

–কি নাম করে উনি বলেছিলেন?

–না....আমি...কি জানি অনেক দিনের কথা তো, মনে করতে পারছি না ঠিক।

–হাতজোড় করে আমি অনুরোধ করছি। চেষ্টা করুন মনে করতে। নিশ্চয়ই খুনের দায় থেকে আপনি মুক্তি পেতে চান, তাই না? এবার অবাক হল জেমস বেন্টলী।

-মুক্তি?

–হ্যাঁ, মুক্তি।

–আমি....হা। নিশ্চয়ই চাই।

–তাহলে ভাবুন...ঠিক কি কি কথা বলেছিলেন মিসেস ম্যাগিনটি।

-অনেকটা এই ধরনের : সব কিছু নিয়ে নিজের ব্যাপারে মহিলার এত গর্ব...এত গর্বের কিছু নেই...যদি সব জানাজানি হয়ে যায়। আরও বলেন, কেউ নাকি ভাবতেই পারবে না ফটোর মহিলা আর এই মহিলাটি এক, তবে এত বছর আগের ঘটনা ইত্যাদি।

–এ ধারণা তাহলে আপনার মনে কেন এল যে, মিসেস আপওয়ার্ডের কথাই উনি বলতে চেয়েছেন?

-সত্যিই জানি না। তবে কেন যেন ধারণাটা দাণা পাকিয়ে যায়। হয়ত উনি কিছু বলছিলেন মিসেস আপওয়ার্ডের সম্বন্ধে। মন দিয়ে আমিও শুনছিলাম না, বা এখন এতদিন বাদে বলতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলছি, এও হতে পারে। উনি যে কথা বলতেন বড্ড বেশি।

পোয়ারো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন; আমিও মনে করি না যে, উনি মিসেস আপওয়ার্ডের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত উনি অন্য কারও কথা বলেন, ঠিকমত মনে করে আপনি কিছুই বলতে পারলেন না...প্রকৃত তদন্তের গতিও এতে বাধা পাবে। আর কে বলতে পারে, হয়ত কঁসি কাঠে আপনাকেও লটকাতে হবে হয়ত। আচ্ছা, যে সব বাড়িতে মিসেস ম্যাগিনটি কাজ করতেন, সেই সব বাড়ির মহিলাদের সম্বন্ধে উনি কিছু বলতেন?

-হ্যাঁ, কিছু কিছু। কিন্তু আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, মঁসিয়ে পোয়ারো। আমি নিজে তখন এত অশান্তির মধ্যে ছিলাম যে, কোনো কথাই আমার মনে রেখাপাত করত না।

-কিন্তু যে রকম দুশ্চিন্তায় এখন আছেন, সেই তুলনায় কিছু নয়। উনি কি মিসেস কার্পেন্টার (যিনি আগে মিসেস সেলকার্ক ছিলেন) অথবা মিসেস রেগুলের সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন?

–পাহাড়ের ওপরে নতুন বাড়িটার মালিক মিসেস কার্পেন্টাররাই তো? ওঁর স্বামীর তো একটা মস্ত গাড়ি আছে। তখন ভদ্রলোক ছিলেন ভদ্রমহিলার বাগদত্ত। মোটেও মিসেস কার্পেন্টারের ওপর মিসেস ম্যাগিনটির ভালো ধারণা ছিল না। খালি বলতেন, কপালের জোর।

-আর রেগুলের সম্বন্ধে?

–উনি ডাক্তার, না? মনে পড়ছে না আমার বিশেষ কিছু ওঁদের সম্বন্ধে শুনেছি বলে।

–আর ওয়েদারবিরা, বেশ খুশী খুশী দেখাল বেন্টলীকে। মনে আছে আমার ওদের সম্পর্কে কি বলেছিলেন মিসেস ম্যাগিনটি। ধৈর্য নেই ভদ্রমহিলার। যা খুশী তাই করছেন? ভদ্রলোকের কথায় বলেছিলেন, বৌয়ের আঁচল ধরা, মুখে কথাটি নেই, উনি বলেছিলেন, খুব অসুখী পরিবার।

চোখ তুলে তাকালেন পোয়ারো। তাঁর মনে হল এক মুহূর্তের জন্য এই প্রথম বেন্টলীর কথার সুরে এসেছে পরিবর্তন। সত্যিই বেন্টলী বাড়িটা সম্পর্কে চিন্তা করছিল, পরিবারের সম্বন্ধে, তাদের সুখ, অসুখ...

নরম গলায় পোয়ারো বললেন, ওদের চেনেন আপনি? ভদ্রমহিলাকে? ভদ্রলোককে? মেয়েটিকে?

-না না। বরং কুকুরটাকে বলতে পারেন। ফাঁদে আটকা পড়ে যায় একদিন কুকুরটা, একা ওটাকে মুক্ত করতে পারছিল না মেয়েটি। সাহায্য করেছিলাম আমি, এই পর্যন্ত।

পোয়ারোর কানে এ সুরটাও নতুন ঠেকল। আমি সাহায্য করেছিলাম, একটু যেন গর্বের ছোঁয়া কথাটায়। মিসেস অলিভার আর মিস হেণ্ডারসনের মধ্যে যা কথাবার্তা হয়েছিল সেগুলো মনে করার চেষ্টা করলেন পোয়ারো। মৃদুস্বরে তিনি বললেন, আপনারা কথাও বলেছিলেন?

-হ্যাঁ। উনি বলেছিলেন অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন ওঁর মা। উনি খুব ভালোবাসেন মাকে।

-এবং তাকে আপনিও আপনার মায়ের কথা বলেন?

–হ্যাঁ। বেন্টলী সরলভাবে উত্তর দিল।

চুপ করে রইলেন পোয়ারো। বেন্টলী বলল, খুব নিষ্ঠুর জীবন, খুব নির্মম। সারা জীবনেও কেউ কেউ সুখের মুখ দেখতে পায় না।

–তা ঠিক।

–আমার মনে হয় মিস ওয়েদারবিও অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত জীবনে।

–হেণ্ডারসন।

–ও হ্যাঁ। আমায় উনি বলেছিলেন, মিঃ ওয়েদারবি ওঁর সৎপিতা।

–ডীডার হেণ্ডারসন, করুণ নাম। নামটা সুন্দর কিন্তু উনি দেখতে তত সুশ্রী নন।

–আমার মনে হয় যথেষ্ট সুন্দরী উনি।

.

১৯.

মিসেস সুইটিম্যান বললেন, আমার কথাটা তুমি মন দিয়ে শোনো, ব্যস।

নাক টানল এডনা। কিছুক্ষণ ধরেই সে শুনে যাচ্ছে মিসেস সুইটম্যানের কথা। যত্তো সব অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা। একশোবার একই কথা বলেন। শুধু ওরই মধ্যে এডনা ফাঁক পেয়ে নিজের দুটো কথা ওঁর কানে প্রাণপণে তোলার চেষ্টা করছিল–এক, কোনোক্রমেই সে কিছু বলতে পারবে না। আর দুই, ওর বাবা ওর ছাল চামড়া তুলে ফেলবেন। জানতে পারলে।

মিসেস সুইটম্যান বললেন, সেটা হলেও ক্ষতি নেই। তবে খুন সব সময় খুনই এবং যা তুমি দেখেছ তা অস্বীকার করতে তুমি পারো না।

আবার নাক টানল এডনা।

এবং এডনা, যা তোমার করা উচিত....

কথা থামিয়ে মিসেস সুইটম্যান তার দোকানে সদ্য আগত মিসেস ওয়েদারবিকে বোনবার কাটা আর উলের গোলা দিতে এগিয়ে গেলেন।

–মাদাম আপনি অনেকদিন এদিকে আসেননি।

-না–বেশ কিছুদিন যাবৎ ভালো যাচ্ছে না শরীরটা, হার্টের অসুখ, বোঝেনই তো। বেশি সময় কাটে বিছানাতেই।

–শুনলাম, কাজের লোক পেয়েছেন আপনি? এই যে উলি আর কাটা আপনার।

-হ্যাঁ। যথেষ্ট করিল্কর্মা মেয়েটি। রাঁধেও মন্দ না। তবে স্বভাব, বেশভূষা আঁটসাঁট, অসহ্য একেবারে।

-ওহ, আজকাল আসলে মেয়েদের সুশিক্ষাই দেওয়া হয় না। মাত্র তের বছর বয়সে আমার মা কাজে যোগ দেন। রোজ উঠতেন ভোরে পৌনে পাঁচটায়। উনি পরিচারিকাদের প্রধান ছিলেন। আরও তিনজন মেয়ে ছিল ওঁর অধীনে, যাদের উনি চমৎকার তৈরি করে নেন শিখিয়ে পড়িয়ে, কিন্তু এখন? ও সবের পাটই শুধু পুঁথিপড়া বিদ্যেটাই জানে মেয়েরা। যেমন এডনা।

এডনার দিকে দুজন মহিলাই তাকালেন। তখন এডনা কাউন্টারে হেলান দিয়ে পিপারমেন্ট চুষছিল বিমর্ষ মুখে। সত্যিই তার মধ্যে শিক্ষাগত উন্নতির কোনো পরিচয় ছিল না।

মিসেস সুইটম্যান কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন–খুবই বীভৎস মিসেস আপওয়ার্ডের ব্যাপারটা না?

রঙবেরঙের কাটা বাছছিলেন মিসেস ওয়েদারবি। সায় দিলেন তিনি।

–ঠিক বলেছেন। নৃশংস ব্যাপার। ঘটনাটা বাড়ির লোকেরা আমাকে বলতে ভরসাই পায়নি। শেষ পর্যন্ত যেই না বলেছে; হার্টের অবস্থা আমার খারাপ হয়ে গেল। আমি আবার খুব নার্ভাস তো।

-হ্যাঁ, খবরটা আমাদের সকলের পক্ষেই বড় অস্বস্তিকর। বিশেষত রবিনের কথা ভাবলে বড় কষ্ট হয়। ওর পক্ষে এ শোক সামলানো খুবই কষ্টকর হয়েছিল। একেবারে ডাক্তার-টাক্তার ডেকে একাকার কাণ্ড। ও তো এখন লং মিডোস-এ পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকবে বলেছে। অবশ্য এজন্য ওকে দোষ দিই না। জ্যানেট, ওদের পরিচারিকাটি চলে গেছে তার ভাগিনীর কাছে। বাড়ির চাবি পুলিসের হেফাজতে। ওদের অতিথি হয়ে এসেছিলেন যে লেখিকাটি, তিনি আপাতত চলে গেছেন লন্ডনে, তবে আবার কেস চললে আসবেন।

মিসেস সুইটিম্যান অত্যন্ত আত্মপ্রসাদের সঙ্গে সমস্ত তথ্য জানিয়ে দিলেন। মিসেস ওয়েদারবি, উল কেনা ওঁর মূল উদ্দেশ্য হলেও খুব উপভোগ করছিলেন ব্যাপারটা।

–অত্যন্ত অস্বস্তিকর। সমস্ত পরিবেশটাই আমাদের এর আওতায় পড়ে। কোনো পাগলের কাণ্ড নিশ্চয়ই। যখনই ভাবি আমার নিজের মেয়েও বাইরে গিয়েছিল সে রাত্রে তখন যেন সমস্ত শরীরের রক্ত জল হয়ে যায়। আক্রান্ত হতে পারত সেও, খুনও হতে পারত....মিসেস ওয়েদারবি উত্তেজনায় দুচোখ বন্ধ করে ফেললেন–সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এ অঞ্চলে। কোনো অল্পবয়সী যুবক বা যুবতাঁকে সন্ধ্যের পর ঘোরাঘুরি করতে দেওয়া উচিত নয়। জানেন তো, লং মিডোস-এর মিসেস সামারহেস বাড়ির একটা দরজাও বন্ধ করেন না, এমন কি রাত্রেও না। খিড়কীর দরজা, বৈঠকখানার জানলা সবই খোলা থাকে হাট করে যাতে ওর পোষা বেড়াল, কুকুর অবাধে যাতায়াত করতে পারে। এটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে পাগলামী ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না। কিন্তু মিসেস সামারহেস বলেন চুরি হবার হলে, তা হবেই, দরজা জানলা খোলা বা বন্ধ করে তা আটকানো যায় না।

মিসেস সুইটিম্যান বললেন, হয়ত তেমন কিছু সম্পত্তি নেই ওদের চুরি যাওয়ার মত।

দুঃখিতভাবে মিসেস ওয়েদারবি মাথা নেড়ে বিদায় নিলেন জিনিসপত্র গুছিয়ে।

আবার সেই পুরনো তর্ক শুরু হল এডনা আর মিসেস সুইটিম্যানের মধ্যে।

-এডনা, একথা স্বপ্নেও ভেবো না যে, সব সময় যা তুমি মনে কর সেটাই ঠিক। খুনটুন মোটেও ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। সত্যি কথা বল এবং সৎপথে থাকো–তাতেই শায়েস্তা হবে শয়তান, আমার এটাই ব্যক্তিগত বিশ্বাস।

-আমি নিশ্চিত যে, আমার বাবা মেরেই ফেলবেন।

–তোমার বাবার সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে কথা বলব, তা হলেও....

-মৃত মিসেস আপওয়ার্ড এবং এমন কিছু তুমি দেখেছ যা পুলিশ জানে না। ডাকঘরে তুমি কাজ কর তার মানেই একজন সরকারী কর্মচারী তুমি। তোমার কর্তব্য তোমাকেই করতে হবে। কার্ট হেলিং-এর কাছে যেতেই হবে তোমাকে।

নতুন করে এডনা কান্না শুরু করল।–না কার্ট নয়, কার্টের কাছে আমি কি করে যাব? তাহলে সবাই জেনে যাবে।

-তাহলে সেই বিদেশী ভদ্রলোককে, দ্বিধাগ্রস্তভাবে সুইটিম্যান বললেন।

–না না। বিদেশী নয়। কোনো বিদেশীর কাছে আমি এ ব্যাপারে কিছু বলতে যাৰ না।

–হয়ত এ কথাটা তুমি ঠিকই বলছ।

একটা গাড়ি থামার শব্দ হল বাইরে। মিসেস সুইটিম্যানের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

-ওই যে এসে গেছেন মেজর সামারহেস। তুমি বরং খুলে বল সব কিছু। উনি বাতলে দেবেন তোমার পথ।

-না, না, আমি পারব না।

ভেতরে এলেন জনি সামারহেস। তিনটে কার্ডবোর্ডের বাক্স ওঁর হাতে।

-মিসেস সুইটিম্যান সুপ্রভাত। ওজন করে এগুলো দেখুন না, নিশ্চয়ই বেশি হয়ে যায়নি ওজন।

পার্শেলের দিকে মিসেস সুইটিম্যান নজর দিলেন। যখন মেজর সামারহেস স্ট্যাম্প লাগাতে ব্যস্ত, তখন উনি বললেন, মেজর মাপ করবেন, বিশেষ একটা ব্যাপারে আপনার মতামত নিতে চাই আমি, যখন আপনি এ অঞ্চলের বাসিন্দা তখন আপনাকেই জিজ্ঞাসা করা ভালো।

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন বটে মেজর কিন্তু এই সব মেয়েদের ধারণা তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। যেহেতু তার অধিকাংশ পূর্ব পুরুষ বংশানুক্রমে এ অঞ্চলের বাসিন্দা তাই সকলে এঁরা আশা করেন যে সব ব্যাপারে উপদেশ দেবেন তিনিই।

এডনার ব্যাপারে কথাটা। মিসেস সুইটিম্যান জানালেন।

নাক টানল এডনা। সন্দিগ্ধভাবে মেজর তাকালেন এডনার দিকে। জীবনে উনি এত নির্জীব মেয়ে কমই দেখেছেন। ঠিক যেন ছাল ছাড়ানো একটা খরগোস। পুরোপুরি বুদ্ধিও পাকেনি বলেই মনে হয়। বিপদ বলতে আক্ষরিক অর্থে যা বোঝায়, তাতে এ মেয়েটি পড়তেই পারে না।

মেজর কিঞ্চিৎ অনুকম্পা মিশ্রিত গলায় বললেন, কি ব্যাপার?

–স্যার খুনের ব্যাপারটা। খুনটা হয় যে রাত্রে, সেদিন এডনা কিছু একটা দেখেছিল।

জনি সামারহেসের তীক্ষ্ণ ও দ্রুত দৃষ্টি প্রথমে এনা, তারপর মিসেস সুইটিম্যানের ওপর পড়ল। পরে আবার সে দৃষ্টি ঘুরল এডনার দিকে।

তুমি কি দেখেছ, এনা? ফোঁপাতে শুরু করল এডনা। মিসেস সুইটিমান অবস্থা আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করলেন।

-দেখুন মেজর, অনেক গুজবই আমরা শুনেছি। কিছু সত্যি বাকিটা মিথ্যে। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই সত্যি যে, সেদিন রাত্রে একজন মহিলা মিসেস আপওয়ার্ডের সংগে কফি পান করেন?

–হ্যাঁ, তাই বিশ্বাস আমারও। এটা সত্যি কারণ কার্ট হেলিং এ কথা বলেছেন আমাদের।

স্থানীয় পুলিশ কনস্টেবল অ্যালবার্ট হেলিং অত্যন্ত ধীর ভাষী এবং নিজের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে সচেতন।

মেজর বললেন, ও। কিন্তু ওরা তো জানে না কে মহিলাটি।

এডনা কিন্তু তাকে দেখেছে।

এডনার দিকে তাকালেন জনি। ঠোঁট দিয়ে তিনি শিস দেবার ভঙ্গি করলেন।

-ভদ্রমহিলাকে তুমি দেখেছ এডনা। ঢুকতে না বেরিয়ে যেতে?

–মনে তো হল ভেতরে যাচ্ছিলেন বলেই (এডনার গলায় গাম্ভীর্য)। আমি ছিলাম উল্টোদিকের রাস্তায়। ওই গাছগুলোর নিচে। রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে। অন্ধকার জায়গাটা। গেট দিয়ে ভদ্রমহিলা ভেতরে ঢুকলেন, তারপর চলে গেলেন বাড়ির দিকে।

মনের ভার কেটে গেল জনি সামারহেসের।

-ওঃ মিস হেণ্ডারসন ভদ্রমহিলা। এডনা এ কথা পুলিশ জানে। নিজেই ভদ্রমহিলা পুলিশকে জানিয়ে এসেছেন।

মাথা নাড়ল এডনা-না, মিস হেণ্ডারসন নয়।

-নয়? কে তাহলে?

–ঠিক জানি না আমি। আমি মুখ দেখতে পাইনি। আমার দিকে উনি পেছন ফিরে ছিলেন যদিও, কিন্তু উনি কখনোই মিস হেণ্ডারসন নন।

–তুমি সেটা কেমন করে জানলে? মুখটাই তো তুমি দেখনি বলছ।

–কারণ আমি ওঁর চুল দেখেছি, হালকা রংয়ের। মিস হেণ্ডারসনের চুলের রং গাঢ়।

অবিশ্বাসের গলায় মেজর সামারহেসে বললেন, কিন্তু সেদিন রাত্রে তো তেমন ছিল না চাঁদের আলো। তোমার পক্ষে খুব সঠিকভাবে চুলের রং বোঝা সহজ নয়।

কিন্তু দেখেছি আমি। গাড়ি বারান্দায় ছিল আলো। বেরোবার সময় মিঃ রবিন আর লেখিকা ভদ্রমহিলা আলোটা জ্বালিয়ে রেখেই বেরিয়ে যান। আলোর ঠিক নিচেই আগন্তুক মহিলাটি দাঁড়িয়েছিলেন, তার পরনে গাঢ় রংয়ের কোট ছল, কোনো টুপি ছিল না মাথায় এবং চুলে আলো পড়ায় স্পষ্ট দেখতে পেলাম তা হালকা রংয়ের।

খুব আস্তে শিস দিলেন জনি। চোখ দুটো তার এখন গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করলেন, কটা বাজে তখন?

নাক টানল এডনা–সঠিক আমি বলতে পারব না।

মিসেস সুইটিম্যান বললেন, তুমি তবুও আন্দাজ করতে পারো।

তখনো নটা বাজেনি, গীর্জার ঘন্টা শুনেছিলাম। তাতে মনে হয় সাড়ে আটটার পর।

তার মানে সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে। মহিলাটি কতক্ষণ ভেতরে ছিলেন?

জানি না স্যার, কারণ আর বেশিক্ষণ আমি অপেক্ষা করিনি। কোনো শব্দ শুনিনি। কান্না বা চিৎকার কোনোটাই নয়।

গম্ভীরভাবে মেজর সামারহেস বললেন, একটাই করণীয় কাজ আছে আমাদের, তা হল পুলিশকে জানানো।

সশব্দে এডনা কেঁদে উঠল। –আমায় তাহলে বাবা জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।

এডনা একথা বলেই পেছনের ঘরে দ্রুতপায়ে চলে গেল।

মেজরকে মিসেস সুইটিম্যান বললেন, স্যার বড় ছেলেমানুষী এনা করছে। ব্যাপারটা কি জানেন? খুব রাশভারী আর কড়া মেজাজের মানুষ ওর বাবা। এখন খুব অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন এডনার ওপর। কুলাভনে একজন ভদ্রলোক, মার্জিত ছেলের সাথে এডনার বাগানের কথা ঠিক হয়ে গিয়েছিল সব। ছেলেটিকে ওর বাবাও খুব পছন্দ করতেন, কিন্তু আজকালকার মেয়েদের ব্যাপার তো–এডনা ঐ রেগকে ছেড়ে এখন ঘোরাঘুরি করছে চার্লি মাস্টার্সের সঙ্গে।

-মাস্টার্স? মানে মিঃ কোলের কর্মচারী, না?

-হ্যাঁ। আবার বিবাহিত লোকটা। ছেলেমেয়েও আছে দুটি। মেয়েদের পেছনে ঘোরাঘুরি করাই ওর স্বভাব। মোটেই ভালো না লোকটা, এডনার মতিগতি দেখে ওর বাবা চার্লির

সঙ্গে একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন মেয়ের মেলামেশা। সেদিন এডনা বাবাকে বলেছিল সেই রাত্রে ও কুলাভনে সিনেমায় যাচ্ছে রেগের সঙ্গে। আসলে লুকিয়ে ও চার্লির সঙ্গে দেখা করতে যায় ওই রাস্তাতেই, সে রাত্রে চার্লি শেষ পর্যন্ত আসেনি। হয় ওর বৌ আটকে দিয়েছিল ওঁকে নয়তো অন্য কোনো মেয়ের পেছনে ঘুরঘুর করছিল। তাই এডনা ভয় পাচ্ছে যে সবাই জানতে পারলেও ওর বাবার কানেও কথাটা উঠতে দেরি হবে না যে ও চার্লির সঙ্গে এখনো মিশছে।

মাথা নাড়লেন মেজর। কি করে এডনার মত মেয়ে এসব করে উনি ভেবেই পেলেন না। ওর মতন মেয়ের পক্ষে দু-দুজন ছেলে বন্ধু জোটানো।

-তাই বুঝি এডনা কার্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইছে না?

—স্যার আপনি ঠিকই ধরেছেন।

–কিন্তু এসব পুলিশকে জানানো উচিত। এ ব্যাপারে ওরা কৈফিয়ত নাও চাইতে পারে আর যদিও বা চায়, ওরা তা গোপন রাখবে অনুরোধ করলে। আমি বরং মিঃ স্পেন্সকে এখানে আসতে বলি-না থাক, গাড়ি করে আমি এডনাকে কিলচেস্টারে নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে এডনা জবানবন্দী দিলে এখানকার কেউ তা জানতে পারবে না। আমি শুধু ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি যে আমরা যাচ্ছি।

এর কিছুক্ষণ পরেই মিসেস সুইটিম্যানের উৎসাহ পেয়ে এডনা জনি সামারহেসের স্টেশন ওয়াগনে চেপে কিলচেস্টারের পথে রওনা দিল।

.

২০.

কিলচেস্টারে এরকুল পোয়ারো মিঃ স্পেন্সের অফিসেই ছিলেন। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন, কোলের ওপর দিয়ে হাত দুটো। হাতের কাজ শেষ করে তার দিকে স্পেন্স তাকালেন।

-মঁসিয়ে পোয়ারো, কিছু আসছে কি মাথায়?

–চিন্তা করছি, চেষ্টা করছি।

–ভালো কথা। ভুলে গেছি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে, বেন্টলীর সংগে যে আবার দেখা করলেন, কোনো নতুন তথ্য পেলেন?

মাথা নাড়লেন পোয়ারো। ভুরু কুঁচকানো তার। তিনি এই মুহূর্তে বেন্টলীর কথাই ভাবছিলেন। ভাবছিলেন তাঁর মত একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা যেখানে বিনা পারিশ্রমিকে ব্যয় করছেন নিজের বুদ্ধি আর সময় শুধুমাত্র পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে, অভিযুক্ত ব্যক্তিটি সেখানে এত কাঠখোট্টা, এটা ঠিক উচিত নয়। বরং একজন অল্পবয়সী সুন্দরী যুবতী, সরল কিন্তু বেহিসাবী, বা সুশ্রী যুবক একটি যে কর্মদক্ষ, কাব্যনুরক্ত অথচ উদ্ধত চরিত্র, যেন এরকম হলেই ভালো হত। তার বদলে কি না জেমস বেন্টলী। মানসিক বিকারগ্রস্ত আত্মকেন্দ্রিক একটা ছেলে, যে শুধু নিজের সম্বন্ধে ছাড়া কিছুই আর ভাবে না, তাছাড়াও এমন অকৃতজ্ঞ আর নির্বিকার যে, তারজন্য এই যে এত চেষ্টা করা হচ্ছে সেজন্য একটা

শুকনো ধন্যবাদ পর্যন্ত দেওয়া দরকার বলে মনে করে না। ভাব দেখায় এমন যেন ওর কেনো কিছুতেই কিছু এসে যায় না। শুধু এই কারণেই ফাঁসিকাঠে ওকে ঝোলালেও বোধহয় দোষ হত না।

পোয়ারোর মনে এই সব চিন্তা চলছিল, স্পেন্স তাকে উদ্দেশ্য করে যখন কথা শুরু করেছিলেন। পোয়ারো বললেন, দেখুন, আমাদের দুজনের সাক্ষাৎকারটা তেমন কিছু ফলপ্রসু হয়েছে বলে মনে করি না আমি। যেটুকু দরকারী কথা বেন্টলীর মনে করতে পারা উচিত ছিল, তাও মনে করতে পারেনি সে। ওর যা মনে পড়েছে তা এত অস্পষ্ট যে, তার থেকে কোনো যুক্তিবদ্ধ উপসংহার পাইনি আমি। তবে একথা সত্যি যে সানডে কম্প্যানিয়নর ওই ফিচারটা পড়ে যথেষ্ট উত্তেজিত হন মিসেস ম্যাগিনটি। এমন কারও কথা বেন্টলীকে উনি বলেন যে, উল্লিখিত কোনো একটা মামলার সাথে জড়িত এবং ব্রডহিনির বাসিন্দা বর্তমানে।

–কোন মামলা, মিঃ স্পেন্স জিজ্ঞাসা করলেন।

আমাদের বন্ধু বেন্টলী সেইটুকু বলতে পারছে না সঠিকভাবে। দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলল হয়ত ক্রেগ মামলা হতে পারে। কিন্তু ঐ একটা মামলার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ও নিজে ওয়াকিবহাল সেইজন্য ওটা ওর আন্দাজও হতে পারে। কিন্তু বাসিন্দাটি একজন মহিলা। বেন্টলী এ প্রসঙ্গে মিসেস ম্যাগিনটির কথা উল্লেখ করেছে, এমন কেউ, সব জানাজানি হয়ে গেছে বুঝলে সে আর অত গর্ব করতে পারবে না।

–গর্ব?

–হ্যাঁ, অর্থব্যঞ্জক কথাটা, তাই না? কিন্তু গর্বিত মহিলাটি কে? কিছুই জানতে পারা যায়নি সে সম্বন্ধে?

–একবার বেন্টলী বলল মিসেস আপওয়ার্ড হয়ত, কিন্তু যতদূর মনে হয় আমার সেরকম হওয়ার কোনো কারণ নেই।

ভদ্রমহিলাকে অত্যন্ত অহংকারী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভেবেই হয়ত একথা বলেছিল। কিন্তু মিসেস আপওয়ার্ড হতেই পারেন না কারণ তিনি মৃতা এবং এমন একটি কারণে যে কারণে মিসেস ম্যাগিনটিও খুন হন। কারণটি একটি ফটোর সনাক্তকরণ।

পোয়ারো বিষণ্নভাবে বললেন, ওঁকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম।

বিড়বিড় করে স্পেন্স বললেন, লিলি গ্যাম্বল। বয়সের হিসেব মত দেখতে গেলে মাত্র দুটো নাম পাওয়া যাচ্ছে মিসেস রেগুল এবং মিসেস কার্পেন্টার। আমি বাদই দিচ্ছি মিসেস হেণ্ডারসনকে, ওর একটা জন্মপরিচয় আমরা জানি।

এবং একেবারেই অজ্ঞাতকুলশীল অন্য দুজন? দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্পেন্স। জানেনই তো কি দিনই না চলছে আজকাল। সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে যুদ্ধ। যে স্কুলে লিলি ছিল, তার আজ কোনো চিহ্নই নেই। মানুষ জনের কথাই ধরুন। অজ্ঞাতকুলশীলদের সংখ্যাই বেশি যুদ্ধের বাজারে। ব্রডহিনির ব্যাপারেই দেখুন, নিশ্চিতভাবে আমরা চিনি সামারহেসদের যারা কিনা আজ তিনশো বছর যাবৎ বংশপরম্পরায় ব্রডহিনির বাসিন্দা। আর মিঃ কার্পেন্টারকে চিনি যার বংশের অনেকে যথেষ্ট পরিচিত। ডঃ রেগুল? এইটুকুই আমরা জানি যে উনি কোথায় শিক্ষালাভ করেন বা কোথায় চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবন

শুরু করেন কিন্তু আমাদের ওঁর বংশ পরিচয় অজানা। ডাবলিনের বাসিন্দা ছিলেন ওঁর স্ত্রী, ইভা সেলকার্ক। মিঃ কার্পেন্টারকে বিয়ে করার আগে যুদ্ধের কারণে ভদ্রমহিলা ছিলেন নিহত কোনো ব্যক্তির সদ্যবিধবা যুবতী স্ত্রী। যে কেউই তো সে সাজতে পারে। ওয়েদারবিদের কথাই ধরুণ–এরা তো পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত চষে বেড়িয়েছেন, কেন? হয়ত বা ওঁরা কোনো সৎ নয়তো কোনো কুকীর্তি করেছেন। এ কথা বলছি না যে, কোনো সংবাদই আমরা সংগ্রহ করতে পারবো না, কিন্তু তাতেও তো সময় লাগবে। নিজে থেকে লোকজন কেউ আপনাকে কিছু খবর দেবে না।

-কারণ তাদের অনেকেই লুকোতে চায় কিছু না কিছু। কিন্তু সেটা নাও খুন হতে পারে। পোয়ারো বললেন।

বোধহয় তাই হবে। হয়ত তারা যা করেছে, তা আইনের চোখে অল্পবিস্তর দোষের। হয়ত সাধারণ কোনো ঘটনা। যাই হোক এত কষ্ট করে লোকে তা লুকিয়ে রাখে যে, আসল খবর খুঁজে বের করা ঢের বেশি কষ্টকর।

–কিন্তু অসম্ভব তো নয়।

-না। কিন্তু সময় সাপেক্ষ। ধরুন যদি লিলিই ব্রডহিনিতে থেকে থাকে, তা হলে হয় সে ইভ কার্পেন্টার নয়ত শেলা রেগুল। দুজনেরই রুটিন মাফিক জবানবন্দী নিয়েছি আমি। ওঁরা নাকি খুনের সময় দুজনেই বাড়িতে ছিলেন। সরলতার প্রতিমূর্তি মিসেস কার্পেন্টার আর সত্যিই মিসেস রেগুলের স্নায়ু দুর্বল। কাজেই আমরা সেদিকেও এগোতে পারছি না।

মনে পড়ল পোয়ারোর লং মিডোস-এর বাগানে মিসেস রেগুলের সঙ্গে তার নিজের দেখা হয়ে যাওয়ার কথা। একটা বেনামী চিঠি পেয়েছিলেন ভদ্রমহিলা (অন্তত পোয়ারোকে উনি সেরকমই বলেছিলেন)। এখনো ওই ব্যাপারে পোয়ারোর সন্দেহ কাটেনি।

স্পেন্স বললেন, এবং আমাদের সতর্ক হয়ে চলতে হবে। কারণ যদি দোষীও হয় একজন, অন্যজন তো নির্দোষ।

–আর মিঃ কার্পেন্টারও ভাবী সদস্য লোকসভার এবং বাসিন্দাদের মধ্যে যথেষ্ট নামকরা লোক।

যদি খুনের ব্যাপারে ওঁর স্ত্রী সত্যি জড়িত থাকেন, তাহলে ওঁর সুনাম, প্রতিপত্তি এসব কিছুই শেষ পর্যন্ত কাজে আসবে না।

-আমি তা জানি, কিন্তু সব দিক দিয়ে আপনাদের সতর্ক সন্দেহমুক্ত, নিশ্চিত হতে হবে, তাই না?

–ঠিক কথা। কিন্তু আপনি এটা তো জানেন যে, এই দুজনের মধ্যেই দোষী কোনো একজন।

-না, ঠিক তা বলতে পারি না। অন্য সম্ভাবনাও রয়েছে...

—যেমন?

পোয়ারো এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, কেন ফটো রাখে মানুষ?

-কেন আপনার সাথে কিছুনেক জিনিস ফেলে কেন মানুষ ফটোগ্রাফ ফটোগ্রাফ মনে

-কেন? ভগবান জানেন। লোকে অনেক আবর্জনাই প্রাণে ধরে ফেলতে পারে না।

–আমি আপনার সাথে কিছুটা একমত। কেউ কেউ অনেক জিনিস জমায়। কেউ বা প্রয়োজন ফুরোলেই টান মেরে অনেক জিনিস ফেলে দেয়। এটা যার যার স্বভাবের ব্যাপার। কিন্তু বিশেষভাবে ফটোর কথাই আমি বলতে চাইছি। কেন মানুষ ফটোগ্রাফ রাখে?

প্রাণে ধরে ফেলতে পারে না বলে : কিংবা হয়ত তাদের পুরনো কথা ফটোগ্রাফ মনে করিয়ে দেয়...ধরুণ স্মৃতি রাখার জন্য.....

–ঠিক তাই। পুরনো কথা মনে পড়ে। আবার জানতে চাইছি আমরা কেন? একজন বিগত যৌবনা ভদ্রমহিলা কেন তার যুবতী বয়সের ছবি রেখে দেন সযত্নে, প্রথম কারণ আত্মতুষ্টি। হয়ত বয়স কালে ভদ্রমহিলা যথেষ্ট সুন্দরী ছিলেন। ফটোতে দেখলে এক ধরনের আনন্দ পান উনি। যখন আয়নায় উনি নিজের চেহারাটায় প্রৌঢ়ত্বের ছাপ লক্ষ্য করেন, তখন ফটোতে যৌবনের সৌন্দর্য ওঁকে উৎসাহিত করে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোনো বন্ধুকে বলেন–আমি কি ছিলাম আঠারো বছর হয়সে। মিঃ স্পেন্স, আপনি কি আমার কথা সমর্থন করছেন?

–হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমি মানি যে, এটা সত্য।

–তাহলে প্রথম কারণ আত্মতুষ্টি। আমার মতে দ্বিতীয় কারণ অবেগপ্রবণতা।

–দুটোই তো এক।

-না, ঠিক এক নয়। কারণ দ্বিতীয় কারণটা শুধু আপনাকে নিজের নয়, অন্য লোকেরও ছবি রাখতে বাধ্য করে। যেমন ধরুণ আপনার মেয়ের ছোটবেলার ইজের পরা ছবি, যে মেয়ে হয়ত এখন বিবাহিতা।

–হ্যাঁ, হা, আমি এ-রকম অনেক দেখেছি। স্পেন্স হাসতে হাসতে বললেন।

–ছেলেমেয়েদের অনেক সময় অস্বস্তি লাগে কিন্তু এ ব্যাপারে মায়েরা অত্যুৎসাহী। আবার ছেলেমেয়েরাও ছবি রাখে মায়ের, যদি অল্প বয়সে তাদের মা মারা যান। এই আমার মা, অল্প বয়সে...তারা ভাবে।

–বোধহয় আমি আঁচ করতে পারছি মিঃ পোয়ারো, কোন দিকে এগোচ্ছেন আপনি।

–আর তৃতীয় কারণ, আত্মতুষ্টি নয়, আবেগও নয়, নিছকই ঘৃণা।

–ঘৃণা?

-হ্যাঁ। ধরুন চরিতার্থ করতে হবে প্রতিহিংসা। হয়ত কেউ অনেক ক্ষতি করেছে আপনার। তার একটা ছবি আপনি নিজের কাছে রেখে দিলেন যাতে আপনি কোনোদিনও তার কথা না ভোলেন। এমন কি হয় না, বলুন?

-কিন্তু, নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য হতে পারে না।

পারে না বুঝি?

–আপনি কি ভাবছেন ঠিক বলুন তো?

বিড়বিড় করে পোয়ারো বললেন, অনেক সময় খবরের কাগজে ভুল তথ্য ছাপা হয়। সানডে কম্প্যানিয়ন বলছে যে ইভা কেনকে মিঃ ক্রেগের বাড়িতে নিযুক্ত করা হয়েছিল বাচ্চার দেখাশুনোর জন্য। কিন্তু আসল ঘটনাটা কি?

–আসল ঘটনা ওটাই। এখানে কাগজের তথ্য ঠিকই আছে। কিন্তু আমরা তো লিলি গ্যাম্বলকে খুঁজছি।

হঠাৎ চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন পোয়ারো। স্পেন্সকে হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন, লিলির দিকে আপনি ভালো করে তাকিয়ে দেখুন। মোটেই সুশ্রী না লিলি, এবড়ো খেবড়ো দাঁত, কাঁচের মোটা চশমা, সব মিলিয়ে প্রায় কুৎসিতই বলা চলে। সুতরাং আমার বক্তব্যের প্রথম কারণটার জন্য ওর ছবি কেউই রাখবে না। ইভা কার্পেন্টার, শেলা রেগুল দুজনেই যথেষ্ট সুন্দরী। যদি সত্যিই ওদের মধ্যে কেউ লিলি হন, তাহলেও কারও হাতে পুরনো ছবি পড়ার আগে ওরা দুজনেই তো ছিঁড়ে ফেলবেন টুকরো টুকরো করে।

এবার ভাবুন দ্বিতীয় কারণটির কথা। স্নেহ, ভালোবাসা ইত্যাদি আবেগের কথা ধরা যাক। লিলি ছোট ছিল যখন, কেউ কি তখন স্নেহ করত ওকে, যা চরিত্র লিলির তাতে তা

অসম্ভব। ও চিরদিনই অনাদর পেয়েছে। যিনি ওকে একমাত্র ভালোবাসতেন, সেই ওর পিসী, তার পরিণতি হয় অত্যন্ত করুণ। সুতরাং দ্বিতীয় কারণে ওর ছবি কেউ রাখবে না। তৃতীয় কারণ? কেউ ওকে ঘৃণাও করত না। যে পিসীকে ও মেরে ফেলে, তার স্বামী বা স্বজন বলতে কেউ ছিল না। ঘৃণা নয়, সকলে ওকে করুণা করত।

মোদ্দা ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আপনার হিসেব মত ওর ফটো কারও কাছে থাকার কথা নয়।

–ঠিক ধরেছেন। আমার চিন্তার ফল এটাই।

–কিন্তু কেউ রেখেছিল। এবং সেই ফটো মিসেস আপওয়ার্ড দেখেন।

–সত্যি উনি কি, দেখেছিলেন?

–ধৎ। আরে মশাই, সে কথা তো আপনিই বলেছিলেন আপনাকে নাকি উনি বলেছেন, হ্যাঁ, তাই বলেছিলেন স্বগতা মিসেস আপওয়ার্ড। কিন্তু কোনো কোনো ব্যাপারে উনি গোপনীয়তা পছন্দ করতেন। নিজের ব্যাপার নিজেই দেখা পছন্দ করতেন। আমি ছবিগুলো ওঁকে দেখিয়েছিলাম এবং সেগুলোর মধ্যে থেকে উনি একটা ছবি সনাক্ত করেন। কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে গোপন করেন সেটা। ব্যাপারটা নিয়ে নিজেই অনুসন্ধান করবেন ঠিক করেছিলেন। ইচ্ছে করেই তাই অন্য ফটো সনাক্ত করে ভুল পথে আমাদের চালিত করেন।

–কিন্তু কেন? আগেই তো আমি বললাম উনি নিজের হাতে নিতে চেয়েছিলেন।

ব্ল্যাকমেলের কোনো ব্যাপার নয় তো এটা? অনেক টাকার মালিক কিন্তু ভদ্রমহিলা। সব টাকাই নাকি ওনার স্বামীর।

-ওঃ না। ব্ল্যাকমেল নয়। হয়ত ছবি দেখে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন যাকে তাকে উনি পছন্দ করতেন। এবং সেজন্যই চাননি যে, তাকে আমরা খুঁজে পাই। সে যাই হোক না কেন অত্যন্ত বেশি ছিল ওঁর কৌতূহল। গোপনে তার সাথে উনি কথা বলতে চান এবং সেই সময় জানবার চেষ্টায় ছিলেন যে, সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত কিনা ম্যাগিনটি হত্যার ব্যাপারে।

–তা হলে তো বাকি তিনখানা ফটোর ব্যাপারে মাথা ঘামানো উচিত আমাদের।

-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। মিসেস আপওয়ার্ড প্রথম সুযোগেই ফটোর মহিলার সঙ্গে কথা বলতে চান। ওঁর ছেলে আর মিসেস অলিভার যখন থিয়েটারে গেলেন সেই সময়টারই সুযোগ নেন উনি।

–এবং উনি ফোন করেন মিস হেণ্ডারসনকে। আবার মিস হেণ্ডারসন তাহলে ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়লেন দেখছি এবং তাঁর মা ও।

স্পেন্স বিষণ্ণ গলায় আরও বললেন, মঁসিয়ে পোয়ারো, জাল যতই গুটিয়ে আনতে চাই, আপনি ততই ব্যাপারটা কঠিন করে দেন, তাই না?

মিসেস ওয়েদারবি

২১.

মিসেস ওয়েদারবি ডাকঘর থেকে অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে বাড়ি ফিরে এলেন। নিজেকে উনি যতটা অসুস্থ বলে দাবী করেন সেই অনুপাতে ওঁর তৎপরতা অস্বাভাবিক বেশি এখন। কিন্তু বাড়ির দরজায় পা দেওয়া মাত্র হাঁপানো শুরু হল ওঁর এবং সোজা এসে বসবার ঘরে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন। যে ঘন্টাটা পরিচারিকাকে ডাকার জন্য, সেটা ছিল হাতের কাছেই। জোরে জোরে সেটা উনি বাজালেন। কিন্তু এল না কেউ। অধৈর্য হাতে মিসেস ওয়েদারবি একটানা ঘন্টা বাজাতে শুরু করলেন। মড উইলিয়ামস এবার ঘরে ঢুকল। সে পরেছিল ফুলকাটা ছাপের একটা ঢোলা জামা। হাতে ঝাড়ন।

-মাদাম আমায় ডাকছিলেন?

–আমি দু-দুবার ঘন্টা বাজিয়েছি। ঘন্টাটা যখন বাজাই তখন এটুকু আশা আমি করি যে, কেউ না কেউ সঙ্গে সঙ্গে আসবে। সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারতাম আমি।

–অত্যন্ত দুঃখিত আমি মাদাম। একটু ব্যস্ত ছিলাম ওপরে।

–জানি, ওপরে তুমি ছিলে। আমার ঘরে। তোমার পায়ের শব্দ আমি শুনতে পেয়েছি। সব দেরাজগুলো টেনে টেনে তুমি খুলে দেখছিলে। কেন যে তা জানেন ঈশ্বরই, জিনিসপত্র সব আমার ঘাঁটাঘাঁটি করা নিশ্চয়ই তোমার কাজ নয়?

-মাদাম এ সব আমি লুকিয়ে করছিলাম। ছড়ানো ছিটানো জিনিসগুলো আপনার গুছিয়ে রাখছিলাম।

বাজে বোকো না। তোমাদের মত প্রতিটি কাজের লোকের এরকম বদভ্যাস আছে। আমি বরদাস্ত করব না এসব। ভীষণ শরীরটা খারাপ লাগছে আমার। বাড়িতে কি ডীডার আছে?

-কুকুটাকে নিয়ে উনি একটু হাঁটতে বেরিয়েছেন।

-যত্তো সব মূখের ব্যাপার। খেয়াল রাখা ওর উচিত যে, আমার ওকে দরকার হতে পারে। একটা ডিম দুধে গুলে তাতে একটু ব্র্যাণ্ডি দিয়ে নিয়ে এস। খাবার ঘরের পাশের দিকের তাকে একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল আছে দেখ।

-কিন্তু ডিম মাত্র তিনটে আছে, কাল লাগবে প্রাতঃরাশে।

–একজন কেউ ডিম খাবে না কাল। নাও, তাড়াতাড়ি কর। হাঁ করে ওখানে দাঁড়িয়ে আমায় কি দেখছ? তুমি বড় বেশি সাজগোজ কর। এটা ঠিক না।

কুকুরের ডাক শোনা গেল হলঘরে। কুকুর নিয়ে ডীডার বসবার ঘরে ঢুকল। ঘর থেকে মড বেরিয়ে গেল।

ডীডার দ্রুত নিঃশ্বাসে বলল, তোমার গলা শুনলাম আমি। ওকে তুমি কি বলছিলে?

–কিছু না।

–ওকে খুব রাগী রাগী দেখাচ্ছিল।

–শুধু ওকে আমি সামান্য শায়েস্তা করে দিয়েছি। অবাধ্য মেয়ে।

-মামণি, খুব কি বকুনি দেবার দরকার ছিল? আজকাল তোক পাওয়া কি মুশকিলের ব্যাপার জানোই তো। আর ও বেশ রান্না করতে পারে ভালো।

–আর ও যে দুর্ব্যবহার করল আমার সাথে তাতে বুঝি কিছু এসে যায় না? আমি খুব অসুস্থবোধ করছি। বোধহয় হাঁটাটা বড্ড বেশি হয়ে গেল।

-মামণি তোমার বেরোনো উচিত হয়নি। আমায় তো বলনি যে, তুমি বেরোবে?

–ভাবলাম বাইরের হাওয়া লাগলে হয়ত ভালো লাগবে একটু। যা গুমোট ভেতরে। যাকগে, কিছু এসে যায় না। যদি আর পাঁচজনের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াই, তাহলে কোনো মানেই হয় না বেঁচে থাকার।

–আমাদের কাছে তুমি তো মামণি বোকা নও। তুমি না থাকলে আমি তো মরেই যাব।

-লক্ষ্মী মেয়ে তুমি, সোনা আমার। কিন্তু আমি তো জানি কারণে অকারণে কত উৎপাত করি তোমাকে।

-না না। কক্ষনো মুখে আনবে না এসব বাজে কথা।

মিসেস ওয়েদারবি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজলেন।

–আর কথা বলতে পারছি না আমি, বরং চুপ করে একটু শুয়ে থাকি।

-যাই, তোমার খাবার দেবার জন্য মডকে তাড়া দিই গিয়ে। দৌড়ে ঘর থেকে ডীডার বেরিয়ে গেল। ওর কনুইয়ের ধাক্কায় যাবার সময় পেতলের একটা ছোট্ট মূর্তি টেবিলের ওপর থেকে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল।

–এত তাড়াহুড়ো করে মেয়েটা।

মিসেস ওয়েদারবি মন্তব্য করলেন।

খুলে গেল দরজাটা। ঘরে ঢুকলেন মিঃ ওয়েদারবি।

দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর চোখ খুললেন মিসেস ওয়েদারবি।

-ওঃ, রজার তুমি।

–কিছুতেই আমি ভেবে পাই না এত গোলমাল হয় কেন? নিশ্চিন্ত হয়ে এ বাড়িতে একটু পড়াশুনো করারও উপায় নেই।

যাওয়ার সময় ডীডার টেবিলে ধাক্কা লেগে শব্দ হয়েছে। ও এইমাত্র কুকুর নিয়ে ফিরল।

পেতলের মূর্তিটাকে মিঃ ওয়েদারবি উঠিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, অকারণে হুড়োহুড়ি না করার মত বয়স নিশ্চয়ই ডীডারের হয়েছে।

–জানোই তো, ও একটু অন্যরকম।

হতে পারে। কিন্তু ওর এই বয়সে আর একটু শান্ত, সুশৃঙ্খল হওয়া দরকার। ও কি ওর কুকুরটাকেও একটু চুপ করাতে পারে না?

–ওকে আমি বলে দেব, রজার। যদি এ বাড়িতে ও থাকতে চায়, তাহলে ইচ্ছে অনিচ্ছেগুলো আমাদের মেনে চলতে হবে। তাছাড়া এ বাড়িটা ওর নিজের বলে মনে করাও বাঞ্ছনীয় নয়। ও যেন না ভাবে যে, ওর যা খুশি তাই করতে পারে এ বাড়িতে।

ডীডার চলে গেলেই হয়ত তুমি খুশি হতে রজার।

অর্ধনিমীলিত চোখে লক্ষ্য করছিলেন ভদ্রমহিলা স্বামীকে।

-না না, তা নয় ও আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকবে। ওর কেই বা আছে। ওকে আমি বলবখন একটু ভালোভাবে চলাফেরা করতে। এডিথ তুমি কি বেরিয়েছিলে?

–হ্যাঁ। এই ডাকঘরের দিকে একটু গিয়েছিলাম।

নতুন কোনো খবর পেলে, মিসেস আপওয়ার্ডের ব্যাপারে? এখনো পুলিশ জানতে পারেনি কার কীর্তি এটা।

–কোনো কর্মের না পুলিশ। কোনো কারণ পেয়েছে কি খুন করার? কে পাবে ওঁর টাকা পয়সা?

নিশ্চয়ই ওঁর ছেলে। তাহলে এটা বাইরের কোনো ছিঁচকে চোরের কাণ্ড মনে হয়। তোমার বলে রাখা উচিত কাজের মেয়েটিকে যাতে আমাদের বাড়ির সদর দরজাটা বন্ধ করে রাখে সব সময়। বিশেষত সন্ধ্যের পর কেউ এলে চেন লাগিয়ে তবে যেন ছিটকিনি খোলে দরজার। লোক আজকাল বড় নির্মম হয়ে যাচ্ছে।

-যতদূর শুনেছি মিসেস আপওয়ার্ডের কোনো কিছুই খোয়া যায়নি।

–আশ্চর্য।

–মানে মিসেস ম্যাগিনটির বেলায় যা হয়েছিল; সে ধরনের কিছু নয়।

-মিসেস ম্যাগিনটি? ও সেই মহিলাটি। মিসেস আপওয়ার্ডের ওখানে উনি কাজ করতেন।

–এডিথ বোকার মত কথা বোলো না। তাতে হয়েছেটা কি?

চোখ বন্ধ করলেন মিসেস ওয়েদারবি। ঘর থেকে মিঃ ওয়েদারবি বেরিয়ে যেতে উনি একটু আপনমনেই হাসলেন। খানিকক্ষণ বাদে চমকে চোখ খুললেন। মড একটা গ্লাস হাতে ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

মাদাম, আপনার পানীয়। মডের পরিষ্কার চাঁছাছোলা গলা। নিস্তব্ধ বাড়িতে কথাটার প্রতিধ্বনি শোনা গেল স্পষ্ট। ওর দিকে মিসেস ওয়েদারবি সতর্কভাবে ভাবলেন। কি

লম্বা, ঋজু এই মেয়েটি। দীর্ঘদেহী ছায়ামূর্তির মত ও দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে–ওঁর মনে হল এ কথায়। আবার এ কথাটা হঠাৎ কেন মনে এল, ভেবে অবাক হলেন নিজেই।

কনুইতে ভর দিয়ে উঠে গ্লাসটা উনি হাতে নিলেন। মড ধন্যবাদ।

ঘুরে দাঁড়িয়ে মড দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মিসেস ওয়েদারবিকে কেন কে জানে, মনে হচ্ছিল একটু চিন্তাক্লিষ্ট বলে।

.

২২.

পোয়ারো ব্রডহিনিতে ফিরলেন একটা ভাড়া গাড়িতে করে। তিনি অসম্ভব ক্লান্তিবোধ করছিলেন অতিরিক্ত চিন্তার চাপে। এত চিন্তা করেও কোনো কূলকিনারা পাচ্ছেন না। একটা অদৃশ্য নকশার অস্তিত্ব চোখের সামনে অনুভব করছেন অথচ সেটা সূক্ষ্মতার জন্য কিছুতেই তার চোখে ধরা পড়ছে না। পথে সামারহেসদের স্টেশন ওয়াগানটা বিপরীত দিক থেকে তার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র অন্যমনস্ক থাকার দরুন সামারহেস বা ওর সহযাত্রিনীটিকে তিনি খেয়ালই করলেন না।

লং মিডোস-এ পৌঁছে সোজা বসবার ঘরে ঢুকে গেলেন। একটা শাকের বাটি ছিল চেয়ারের ওপর। ওটাকে সরিয়ে আরাম করে বসলেন।

টাইপরাইটারের খটখট শব্দ ওপর থেকে কানে আসছিল। ওর সদ্য লেখা নাটক নিয়ে রবিন ব্যস্ত। পছন্দ হয়নি বলে তিন তিন বার টাইপ করেও ছিঁড়ে ফেলেছে। ওকে নিশ্চয়ই মায়ের মৃত্যু যথেষ্ট আঘাত দিয়েছে। কিন্তু নিজেকে ছাড়া অন্য বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবা স্বভাব নয় ওর। অবশ্য মুখে বলে, চালিয়ে যাচ্ছি নিজের কাজ, দেখলে শান্তি পাবে মায়ের আত্মা। এ ধরনের কথা অনেকেই বলে থাকে। পোয়ারো দেখেছেন নিজের আন্তরিক ইচ্ছেটা অনেকে মৃতের ইচ্ছে বলে চালিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। সেটাই সুবিধেজনক। তবে এক্ষেত্রে রবিন একথা বলতে পারে কারণ ছেলের ওপর অগাধ আস্থা ছিল মিসেস আপওয়ার্ডের এবং গর্বও কম ছিল না।

চোখ বুজে পোয়ারো ভদ্রমহিলার কথাই ভাবছিলেন। উনি কেমন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন? ওঁর ওরকম একগুঁয়ে ভাবের কারণটা কি হতে পারে?

হঠাৎ জিনিসপত্র ভাঙার জোরে আওয়াজ হল। আলুথালু বেশে মরিন উপস্থিত হলেন।

–কিছুতেই তো আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে কি হল জনির? সেই যে ডাকঘরে পার্সেল নিয়ে গেছে, আর ফেরার নামটি নেই। কাজ তো বহুক্ষণ আগেই হয়ে যাবার কথা, এদিকে আজ মুরগির খোয়াড়ের দরজাটা মেরামত না করলেই নয়।

যথার্থ একজন ভদ্রলোকের পক্ষে মুরগির খোঁয়াড়ের দরজা সারানো অসম্মানজনক পোয়ারোর মতে। নিজে হলে তিনি কখনো রাজী হতেন না। এখন তার অনেক কাজ। দু দুটো খুন, তার ওপর মিসেস আপওয়ার্ডের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

–দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, এর ওপর আবার কৃষি বিভাগের ছাপানো ফর্মটা পাচ্ছি না, খুঁজে দেখলাম সব জায়গায়।

–শাকের বাটিটা আপনার ওখানে আছে।

কোনো উৎসাহ দেখা গেল না মরিনের। কথা চালিয়ে গেলেন, ফর্মটা গত সপ্তাহে এসে গেছে। কোথায় যে রাখলাম। পুলওভার জনির মেরামত করছিলাম, সেটার সঙ্গেই হয়ত রয়ে গেছে।

দেরাজের কাছে গিয়ে দ্রুত গতিতে সেটা খুলে ভেতরের সমস্ত জিনিস মেঝেয় টান মেরে মেরে ফেললেন। পোয়ারো মোটে এরকম অগোছালো ভাব সহ্য করতে পারেন না।

হঠাৎ মরিন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন–এই তো পেয়েছি।

মরিন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই নিজের চিন্তায় পোয়ারো ফিরে যেতে চাইলেন। কিন্তু ঘরের বিশৃঙ্খল চেহারা অসহিষ্ণু করে তুলছিল তাকে। তিনিই দেরাজের কাছে গিয়ে একে একে সব গুছিয়ে তুলতে লাগলেন। পুলওভার, মোজা, উল তারপর আরেকটাতে মোম, ফটো, চিঠির গোছা....।

বেজে উঠলো টেলিফোন। ফোন ধরলেন পোয়ারো।–হ্যালো, হ্যালো।

স্পেন্স উল্টোদিকে কথা বলছিলেন।

–ও, মঁসিয়ে পোয়ারো আপনি। আপনাকেই চাইছিলাম।

আত্মবিশ্বাসের বদলে স্পেন্সের গলায় দ্বিধাগ্রস্তভাব ধরা পড়ল।

তিনি বললেন, আবার এক কাণ্ড ঘটেছে। একে তো আপনি অন্য ফটোর কথা বলে গেলেন। আবার এদিকে ব্রডহিনির ডাকঘরের কর্মচারী মেয়েটি নতুন তথ্য জানাচ্ছে। ওকে এইমাত্র মেজর সামারহেস আমার এখানে নিয়ে এসেছেন। মিসেস আপওয়ার্ড খুন হন যে রাত্রে, সেই রাত্রে তার বাড়ির উল্টোদিকের ফুটপাথে এই মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। বাড়ির ভেতরে এক ভদ্রমহিলাকে রাত সাড়ে আটটা থেকে নটার মধ্যে ঢুকতে দেখেছে। যাকে দেখেছে সে কিন্তু মিস হেণ্ডারসন নয়, এমন কেউ যার চুলের রং হালকা। আবার আমরা সন্দেহভাজনদের তালিকায় নাম পাচ্ছি দুজনের ইভা কার্পেন্টার আর শেলা রেগুল। এখন একটাই প্রশ্ন–কোন জন?

কথা বলার জন্য পোয়ারো মুখ খুলেও কিছু বললেন না। রিসিভার সাবধানে নামিয়ে রাখলেন, সামনের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

টেলিফোন বেজে উঠল আবার, হ্যালো, হ্যালো।

–মঁসিয়ে পোয়ারোর সঙ্গে কি আমি কথা বলতে পারি?

–বলছি।

–আমি মড উইলিয়ামস। একবার ডাকঘরে আসতে পারবেন ১৫ মিনিটের মধ্যে?

–আমি এক্ষুনি আসছি। পোয়ারো মাথায় টুপিটা দিয়ে রওনা দিলেন।

রাস্তায় ল্যাবারনাম থেকে সদ্য আগত স্পেন্সেরই একজন সহকারী পথ আটকালো তার।

সুপ্রভাত, মঁসিয়ে পোয়ারো। সু প্রভাত।

খুব উত্তেজিত দেখচ্ছিল সার্জেন্ট ফ্লেচারকে।

ভালো করে আরেকবার তদন্ত করার জন্য সুপার আমায় পাঠিয়েছিলেন। বহু ছোটোখাটো জিনিস অনেক সময় এড়িয়ে যায় আমাদের চোখ। সব দেরাজগুলো তন্নতন্ন করে দেখেছি। ওখানে গোপন দেরাজও নেই। সমস্ত বইগুলো দেখেছিলাম যদি কোনো চিঠিপত্র ভুলে রেখে যায় ওর মধ্যে।

এবং আপনি কিছু একটা পেয়েছেন?

-না, চিঠি জাতীয় কিছু নয় তবে যথেষ্ট চমকপ্রদ কিছু, মানে অন্তত তাই মনে করি আমি। এই দেখুন।

খবরের কাগজের মোড়ক খুলে একটি জীর্ণ বিবর্ণ পুরনো বই ফ্লেচার বের করলেন।

–এটা রাখা ছিল একটা বইয়ের তাকে। পুরনো বহুদিন আগে ছাপা, কিন্তু দেখুন

ফ্লেচার প্রথম পৃষ্ঠাটা দেখালেন। পেনসিলে আড়াআড়ি ভাবে লেখাইভলিন হোপ।

–এই নামটা, নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার যে...

–হ্যাঁ। ইভা কেন ইংল্যাণ্ড ছাড়বার আগে এই নামটা নিয়েছিল, মনে আছে আমার।

–মনে হয় যে ফটোটা মিসেস ম্যাগিনটি সনাক্ত করেন সেটা মিসেস আপওয়ার্ড। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

-হ্যাঁ বাজি ফেলে আমি বলতে পারি যে যখন এটা আপনি মিঃ স্পেন্সকে দেখাবেন তখন উনি নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে বাকি রাখবেন না।

আশাকরি অতি ভয়ংকর কিছু হবে না।

উত্তর দিলেন না পোয়ারো। তার গন্তব্যস্থলের দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন।

ডাকঘরে পৌঁছে দেখলেন মড দেখছে ডিজাইনের বই। স্ট্যাম্প কিনে ডাকঘর থেকে প্রায় ঝড়ের বেগে পোয়ারো বেরিয়ে এলেন। কিছু দূর এগিয়ে রাস্তায় মডকে ধরে ফেলে হাঁটতে লাগলেন তার পাশাপাশি।

এই দৃশ্য ডাকঘরের জানলা দিয়ে দেখে মিসেস সুইটিম্যান স্বগতোক্তি করলেন, বিদেশীদের এরকমই কাণ্ডকারখানা। লোকটা তো মড উইলিয়মসের ঠাকুর্দার বয়সী।

-ইয়ে, আমায় কিছু বলবেন আপনি?

-দেখুন মঁসিয়ে, আমি জানি না কতটা জরুরী ব্যাপারটা। কেউ একজন মিসেস ওয়েদারবির ঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করেছিল।

-কখন?

–আজ সকালে। বেরিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। মেয়েটিও তার কুকুর নিয়ে গিয়েছিল বাইরে। যথারীতি বুড়ো ভদ্রলোক নিজের পড়ার ঘরে ব্যস্ত ছিলেন। আমিও অন্যান্য দিনের মত রান্নাঘরে ছিলাম। পড়ার ঘরের মত রান্নাঘরটাও অন্য দিকে। কিন্তু সুযোগ পেয়েছিলাম আজ.... বুঝলেন তো?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন পোয়ারো।

–তাই আমি ওপরে ভদ্রমহিলার শোবার ঘরে হানা দিয়েছিলাম। একটা মই দেখি জানলার ঠিক পাশেই–একটা লোক মই-এর ওপর উঠে জানলার ছিটকিনিটা খোলবার চেষ্টা করছে, খুনের ঘটনার পর থেকে ভদ্রমহিলাটি তো আবার যাবতীয় দরজা-জানালা আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ করে রাখেন। বদ্ধ ঘর। লোকটা আমাকে দেখতে পেয়েই নেমে গেল তাড়াতাড়ি আমাদের মালির মইটা দিয়ে। মালি আজ মইয়ে উঠে আইভির ঝাড় ছাঁটছিল। তারপর বোধহয় বিশ্রাম নিতে যায়।

–কে লোকটা? বর্ণনা দিতে পারেন কোনো?

এক পলক মাত্র আমি দেখেছি। আমাকে দেখা মাত্র পালিয়ে যায় লোকটা। মুখ দেখতে পাইনি।

-আপনি কি নিশ্চিত যে, যাকে দেখেছেন সে একজন পুরুষ?

চিন্তা করল মড।

–মানে সেই রকম সাজপোশাক। মাথায় একটা পুরনো ফেল্টের টুপি ছিল। অবশ্য পুরুষের ছদ্মবেশে কোনো মহিলাও হতে পারে।

-খুব চমকপ্রদ ব্যাপার। আর কিছু?

-এখন পর্যন্ত নয়। খুব জাঁহাবাজ ভদ্রমহিলা, ওর ঘরে ঢুকেছিলাম। হাতে নাতে ধরে ফেলে গঞ্জনা দিয়েছেন মা। হয়ত ওঁকে আমি এবার খুনই করে বসব। খুনই হওয়াই উচিত ওঁর। কি দজ্জাল, বাস্।

পোয়ারো মৃদুস্বরে বললেন, ইভলিন হোপ।

–কি বললেন? বিদ্যুৎগতিতে মড ফিরে তাকালো।

–তাহলে আপনি নামটার সঙ্গে পরিচিত?

–কেন? ও হ্যাঁ, ইভা কি যেন নামটা? সে এই নামটা অষ্ট্রেলিয়া যাবার আগেই নিয়েছিল। এ খবর তো সানডে কম্প্যানিয়নে ছিল।

অন্যের কথা সানডে কম্প্যানিয়ন লিখলেও একথাটা কিন্তু লেখেনি। মিসেস আপওয়ার্ডের বাড়িতে পুলিশ একটা বইয়ের মধ্যে পেয়েছে এই নামটা।

চেঁচিয়ে উঠল মড। তাহলে ওই ভদ্রমহিলাই। তাহলে উনি মারা যাননি অষ্ট্রেলিয়ায় ঠিকই বলেছিল মাইকেল....

–মাইকেল?

অচমকা মড বলে উঠল, আর আমি অপেক্ষা করতে পারছি না। আমাকে মধ্যাহ্নভোজে পরিবেশন করতে হবে। ওভেনে রান্না বসিয়ে এসেছি, নষ্ট হয়ে যাবে সব।

প্রায় দৌড়ে চলে গেল মড।

মডের গমন পথের দিকে পোয়ারো একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

এদিকে ডাকঘরের জানলায় মুখ রেখে মিসেস সুইটিম্যান তখন পোয়ারোর চরিত্রের ভালোমন্দ বিচার করছিলেন।

.

পোয়ারো লং মিডোস-এ ফিরে নিজের চিন্তায় ডুবে গেলেন।

কয়েকটা ছোটোখাটো জিনিস তার চোখ এড়িয়ে গেছে। নকশার আদলটা বুঝতে পারছেন,শুধু সাজিয়ে নেওয়ার অপেক্ষা.....

মরিন গ্লাস হাতে স্বপ্নবিষ্ট স্বরে কথা বলছে–কি যেন জিজ্ঞেস করল...মিসেস অলিভারের রেপ-এ সন্ধ্যা কাটানোর গল্প।....সিসিল? মাইকেল?

পোয়ারো নিশ্চিত যে, মিসেস অলিভার একটা নাম উল্লেখ করেছিলেন, ইভা ক্রেন, মিঃ ক্রেগের বাড়ির গভর্নেস.... ইভলিন হোপ....

নিশ্চিতভাবে ইভলিন হোপ।

.

২৩.

পোয়ারোর খোঁজে ইভ কার্পেন্টার সামারহেসদের বাড়িতে এলেন।

পোয়ারোকে ভদ্রমহিলা বললেন, আমি শুনেছি আপনি একজন নামী গোয়েন্দা। আমি ভাড়া করতে চাই আপনাকে।

–মাদাম দেখুন, আমি ট্যাক্সি নই যে আমাকে ভাড়া নেবেন আপনি।

–আপনি তো বেসরকারী গোয়েন্দা। শুনেছি ইচ্ছেমত নাকি তাদের নিয়োগ করা যায়।

–সেই রকম বলা যায় বটে।

-তা আমি তো সেই কথাই বলছি। আমার প্রয়োজনে আপনাকে নিয়োগ করতে চাই। এ জন্যে যত টাকা লাগে দেব আমি।

-কিন্তু কেন? আপনার জন্য আমি কি করতে পারি? ইভ কার্পেন্টার রাগে ফেটে পড়লেন।

-আমাকে আপনি পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। যত্রতত্র ওরা আমার পিছু নিচ্ছে। ওদের ধারণা বোধহয় মিসেস আপওয়ার্ডকে আমিই খুন করেছি। যখন তখন ধরে যা তা প্রশ্ন করছে। আমি এ সব অত্যন্ত অপছন্দ করি। আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে এবার।

পোয়ারো মহিলাটির দিকে তাকালেন। উনি এ কথাটা সত্যি বলেছেন। দেখে মনে হয় কদিনের মধ্যে অনেক বেড়ে গেছে ওঁর বয়স। চোখের নিচে কালি, মনে হয় অনেক রাত দুশ্চিন্তায় ঘুমোননি। যে হাতে ধরে আছেন সিগারেট, সেটাও অল্প অল্প কাঁপছে।

মঁসিয়ে পোয়ারো, এসব আপনাকে বন্ধ করতে হবে।

–এতে কি করার আছে আমার বলুন?

–যে ভাবেই হোক, এ সব আটকান। যেমন মানুষ আমার স্বামী, উনি নিজের হাতে ব্যাপারটা নিলে কবেই শায়েস্তা করে দিতেন ওদের।

–অথচ কিছুই করছেন না উনি?

না, ওঁকে আমি কিছুই বলিনি। শুধু পুলিশকে উনি আমার নিরাপত্তার কথাই বলবেন। উনি সেই রাতে একটা রাজনৈতিক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

–আর আপনি?

–একলা বাড়িতে বসে আমি রেডিও শুনছিলাম।

–সে কথার প্রমাণ আপনি দিলেই পারেন।

–কিন্তু কেমন করে? আমাদের পরিচারক ক্রফটকে আমি একরাশ টাকা দিয়ে হাত করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে আহাম্মকটা প্রত্যাখ্যান করল।

–এঃ হে, আপনি এটা ঠিক করেননি।

–কেন?

-এতে আপনার চাকরবাকর ভাববে আপনি খুন করে এখন ধামাচাপা দিতে চাইছেন ব্যাপারটা।

-কিন্তু ক্রফটকে তো আমি টাকা দিয়েছি...

–কিসের জন্য?

–না, কিছু না।

–মাদাম, ভুলে যাচ্ছেন আপনি; আমার সাহায্য চাইতে এসেছেন আপনি।

–না না, তেমন কিছু নয়। ভদ্রমহিলার কাছ থেকে খবরটা ক্রফটই এনেছিল কিনা।

–মিসেস আপওয়ার্ডের কাছ থেকে?

–হ্যাঁ। সেই রাতে উনি ওঁর কাছে আমাকে যেতে বলেছিলেন।

–আপনি যাননি?

–কেনই বা যাব? ওই বৃদ্ধাকে অসহ্য লাগে। শুধু শুধু বকে বাজে সময় নষ্ট।

–কখন এসেছিল খবরটা?

–তখন আমি বাড়ি ছিলাম না। পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে হবে। ক্রফটই খবরটা নেয়।

–আর টাকা দিয়ে আপনি তার মুখ বন্ধ করলেন? কিন্তু কেন?

–আঃ বুঝতে কেন পারছেন না, এ সবের মধ্যে আমি নিজেকে জড়াতে চাইনি।

-আপনি তার ওপর আরও টাকা দিলেন যাতে আপনার অ্যালিবাই ওরা সমর্থন করে? স্বামী স্ত্রী ওরা কি ভাবল বলুন তো?

-তাতে কি এসে যায় কার?

–আদালতের এসে যায়।

–সত্যি কি আপনি সেরকম মনে করেন নাকি?

–হ্যাঁ।

–শেষ পর্যন্ত ওরা চাকরবাকরের কথাই শুনবে, আমার কথা নয়?

মিসেস কার্পেন্টারের দীঘল নীল চোখের দিকে পোয়ারো তাকালেন। এত কম ভদ্রমহিলার দূরদর্শিতা।

-মাদাম, চশমা পরেন না কেন আপনি?

–মাঝে মাঝে পরি তো। ছোটবেলাতেও পরতাম।

–আর রিং পরতেন দাঁতে, না?

–হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

–নাঃ সেই একদা কুৎসিত হাঁসের রাজহাঁসে পরিণত হওয়ার মত।

–সত্যি। জানেন, ছোটবেলায় আমি বেশ বিশ্রী দেখতে ছিলাম।

–আপনার মাও কি তাই মনে করতেন আপনাকে?

-মায়ের কথা আমার মনে নেই। আপনি ঠিক কি বলতে চান বলুন তো? আমার প্রস্তাব আপনি গ্রহণ করবেন কি করবেন না?

–দুঃখিত আমি। আমি পারব না।

কারণ?

কারণ আমি জেমস বেন্টলীর হয়ে কাজ করছি।

–বেন্টলী? মানে সেই বুদ্বুটা যে মিসেস ম্যাগিনটিকে খুন করেছে? মিসেস আপওয়ার্ডের কি সম্পর্ক তার সঙ্গে?

–হয়ত কিছুই নয়।

–তবে? টাকা পয়সা? চান কত?

–আপনি এখানেই মাদাম বড় ভুল করছেন। আপনি সবকিছুই মাপতে শিখেছেন টাকা দিয়ে। অনেক টাকা আছে আপনার তাই বলে এই রকম আপনি।

–এক সময় আর্থিক সাচ্ছল্য একেবারেই ছিল না আমার।

–হ্যাঁ, সেই রকমই ভেবেছিলাম আমিও। যাক গে.....

.

চলে গেলেন ইভ কার্পেন্টার। নিজের মনে পোয়ারো বললেন, ইভলিন হোপ...।

তার মানে সেই রাত্রে মিসেস আপওয়ার্ড উীডার হেণ্ডারসন আর ইভ কার্পেন্টার আমন্ত্রণ জানান এই দুজনকেই। হয়ত আরও কাউকে ফোন করেছিলেন তিনি...শশব্যস্ত ফিরে এলেন মরিন।

-মঁসিয়ে, আমি আবার কাচিটা এখন খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার বড্ড দেরি হয়ে গেল দুপুরে খেতে। এত বিরক্ত লাগে। তিনটে কঁচির একটাও পাচ্ছি না এখন।

মরিন যথারীতি দেরাজ ঘাঁটতে লাগলেন।

পাওয়া গেল কাঁচিটা। মরিন ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

পোয়ারো দেরাজের ছড়িয়ে থাকা জিনিসগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন–মোম, ছোট কাগজ, ঝুড়ি, ছবির গোছা–ছবি

একদৃষ্টে নিজের হাতে ধরা ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলেন পোয়ারো। হঠাৎ পায়ের শব্দ পাওয়া গেল করিডোরে। তিনি ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে গেলেন সোফার দিকে। সোফায় ছবিটা রেখে তার ওপর চেপে বসলেন।

ঘরে ঢুকে মরিন বললেন, শাকের বাটিটা যে কোথায় ফেললাম।

-এই যে মাদাম। বাটিটা পোয়ারো এগিয়ে দিতে তাকে ধন্যবাদ জানালেন মরিন।

–ইস। আপনি ওই ভাঙা সোফাটায় কেন বসেছেন?

–মাদাম, ঠিক আছে ঠিক আছে। ওই ছবিটা আমি দেখছি।

পোয়ারোর নির্দেশিত ছবির দিকে তাকিয়ে মরিন বললেন, হ্যাঁ মঁসিয়ে, চমৎকার ছবিটা। ওটা জনির পূর্বপুরুষের ছবি। কিছুতেই দেবে না বিক্রি করতে। খুব গর্ব ওর এটা নিয়ে।

–হ্যাঁ, আপনার স্বামীর গর্ব করার মত সত্যিই কিছু আছে।

.

পোয়ারো প্রায় তিনটের সময় ডঃ রেগুলের বাড়ি এলেন। মিসেস স্কট প্রবীণা পরিচারিকা দরজা খুলে দিল।

মিসেস রেগুলের খোঁজ করলেন পোয়ারো।

প্রথম দিনই মিসেস রেগুলকে ভীরু, স্বামীর একান্ত অনুগত বলে মনে হয়েছিল পোয়ারোর। তাকে আজ আরো ফ্যাকাশে আর রুগ্ন বলে মনে হল।

–মাদাম, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।

–নিশ্চয়ই, বলুন।

–মিসেস আপওয়ার্ড কি মারা যাবার দিন আপনাকে টেলিফোন করেছিলেন?

–হ্যাঁ। ফোন ধরেন মিসেস স্কটই, তা প্রায় দুটো আন্দাজ।

–ফোনে উনি কি বলেছিলেন? আপনাকে যেতে?

–হ্যাঁ। আমাকে নাকি উনি জানাতে বলেন যে, রবিন আর মিসেস অলিভার বাড়ি থাকবেন না। বেরোবে পরিচারিকাও। তাই আমি যেন ওঁর সঙ্গে একটু গল্পগুজব করতে যাই।

–যেতে বলেন কটা আন্দাজ?

–নটা বা তারপর।

–গিয়েছিলেন আপনি?

–ভেবেছিলাম যাব। কিন্তু রাতের খাওয়া সারার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল, প্রায় দশটা তখন, মনে হল দেরি হয়ে গেছে। আর গেলাম না।

–এ কথা পুলিশকে আপনি জানিয়েছেন?

মিসেস রেগুল শিশুর মত সরল চোখ তুলে তাকালেন।

–আমার কি জানানো উচিত ছিল? যাইনি বলে, না জানালেও ভেবেছিলাম চলবে, আসলে একটু অপরাধী বলে এখন মনে হয় নিজেকে আমার, আমি সেই রাত্রে গেলে উনি হয়ত খুন হতেন না।

–ও সব ভেবে মন খারাপ করবেন না। আচ্ছা মাদাম, কিসের এত ভয় আপনার?

–ভয়, কই না তো?

–কিন্তু ভয় পেয়েছেন আপনি।

–কি বলছেন যা তা। ভয় পেতে যাব কেন আমি?

জবাব দেবার আগে পোয়ারো এক মুহূর্ত থামলেন।

মাদাম, আমি ভেবেছিলাম হয়ত আমাকে আপনি ভয় পান...

কোনো উত্তর দিলেন না মিসেস রেগুল। কিন্তু তার চোখ বিস্ফারিত হল। তিনি আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

.

২৪.

কথাবার্তা চলছিল স্পেন্স আর পোয়ারোর মধ্যে।

-মঁসিয়ে পোয়ারো, যত শুনছি আপনার কথা ততই সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আপনি বলছেন যে, মিসেস আপওয়ার্ড সেই রাতে তিন তিন জন মহিলাকে ফোন করে ওঁর কাছে আসতে বলেছিলেন। কেন তিন জন? উনিও কি নিশ্চিত ছিলেন না যে, কে লিলি গ্যাম্বল? নাকি এটা লিলি সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারই নয়? আবার ইভলিন নাম লেখা

বইটার কথা ভাবুন। এ থেকে মনে হয় মিসেস আপওয়ার্ড আর ইভা কেন একই মহিলা।

মিসেস ম্যাগিনটির কথা থেকে বেন্টলীও এরকম একটা আন্দাজ করেছিল।

–আবার আমি ভেবেছিলাম নিশ্চিত হয়ে বেন্টলী কিছু বলেনি।

–তা তো বলেইনি। যা চরিত্র ওর তাতে কোনো কিছুই ও তেমন নিশ্চিত করে বলতে পারে না। ও বিশেষ কানও দেয় না মিসেস ম্যাগিনটির কথায়। তা স্বত্ত্বেও যখন ওর মনে হয়েছে মিসেস ম্যাগিনটি মিসেস আপওয়ার্ডের সম্বন্ধেই বলতে চেয়েছিলেন কিছু, তখন তা সত্যি হলেও হতে পারে।

সর্বশেষ খবরে অষ্ট্রেলিয়া থেকে জানা গেছে (যদি অবশ্য, মিসেস আপওয়ার্ড ওখানেই গিয়ে থাকেন, আমেরিকায় নয়) মিসেস হোপ প্রায় কুড়ি বছর আগে মারা যান।

–আগেই শুনেছি সেটা।

–পোয়ারো, সবই জানেন আপনি, না?

এ কথায় পোয়ারো কর্ণপাত করলেন না।

-স্পেন্স, তার মানে একদিকে আমরা দেখছি অষ্ট্রেলিয়ায় মিসেস হোপ মারা গেছেন। আর অন্যদিকে?

অন্যদিকে আমরা জনৈকা মিসেস আপওয়ার্ডকে পাচ্ছি যিনি বিত্তশালী বিধবা, এক পুত্রের জননী। ওঁর স্বামী মারা যান ছেলের জন্মের পরই। শৈশবে ছেলেটির যক্ষারোগ থাকায় বেশির ভাগ সময় ভদ্রমহিলা বিদেশেই থাকতেন।

-এটা কবেকার কথা?

ইভা কেন ইংল্যাণ্ড ছেড়ে যাবার চার বছর পরে। এই ভদ্রমহিলার সাথে মিঃ আপওয়ার্ড পরিচিত হল এবং বিয়ে করেন ওঁকে।

–মিসেস আপওয়ার্ড আসলে ইভা কেন হলেও হতে পারেন। ওঁর কুমারী জীবনের পদবী কি ছিল?

–যতদূর শুনেছি হারগ্রেভস, কিন্তু কি এসে যায় তাতে?

-হ্যাঁ, তা ঠিক। হয়ত ইভা কেন বা ইভলিন হোপ দীর্ঘকাল রোগভোগের পর সুস্থ হয়ে হারগ্রেভস পদবী ধারণ করে।

-আসলে সবই এতদিন আগেরকার ব্যাপার। ওঁকে হয়ত মিসেস ম্যাগিনটি ছবি দেখে সনাক্ত করেছিলেন। তারপর এ সন্দেহ হতেই পারে যে, মিসেস ম্যাগিনটিকে খুন করেন মিসেস আপওয়ার্ড।

হতেও পারে। এমন হতে পারে সে রাত্রে রেডিও বা টি.ভি. প্রোগ্রাম ছিল রবিনের। মনে করে দেখুন, সেই রাতে মিসেস রেগুল মিসেস আপওয়ার্ডের খোঁজে গিয়েও সাড়াশব্দ

পাননি কোনো। জ্যানেট তো মিসেস সুইটিম্যানকে বলেছে যে, পঙ্গু দেখায় যতটা, সত্যি করে ততটা পঙ্গু নন মিসেস আপওয়ার্ড।

এ পর্যন্ত বুঝলাম। কিন্তু এরপর তো নিজেই উনি খুন হলেন–ছবি একটা সনাক্তকরণের পর। তাহলে তো এই সিদ্ধান্তে আবার আসতে হয় যে দুটো খুনের মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই।

-না, তা নয়। যোগসূত্র আছে যথেষ্ট।

–আমি মশাই হাল ছেড়ে দিচ্ছি। ইভলিন হোপ। এটাই রহস্যের চাবিকাঠি।

-ইভ কার্পেন্টার, তার কথাই কি বলতে চাইছেন আপনি? আসলে উনি লিলি গ্যাম্বল নন, ইভা কেনের মেয়ে। কিন্তু এবার তাহলে বলতে হয় নিজের মাকে উনি খুন করেছেন।

-না না। মাতৃহত্যার ব্যাপার না এটা।

–মঁসিয়ে পোয়ারো কি হচ্ছেটা কি? এরপর আপনি বলবেন যে ইভা কেন, লিলি গ্যাম্বল, জেনিস কোর্টল্যাণ্ড আর ভেরা ব্লেক–এরা চারজনই ব্রডহিনির বাসিন্দা।

–হিসেবে চারজনের বেশি আসছে। ইভা কেন মনে রাখবেন মিঃ ক্রেগের বাড়িতে তার বাচ্চার দেখাশুনো করত।

–তাতে কি?

-তার মানে এক বা একাধিক বাচ্চাও সেই বাড়িতে নিশ্চয়ই ছিল? তার বা তাদের কি হল?

-একটি ছেলে আর একটি মেয়ে ছিল। তাদের কোনো আত্মীয় নেই।

তাহলে আরো দুজন আসছে হিসেবে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এই দুজন ছবিটা রাখতে পারে।

–তা বিশ্বাস হয় না আমার।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পোয়ারো। তিনি বললেন, মিঃ স্পেন্স এটা আমাদের হিসেবে ধরতেই হবে। মনে হচ্ছে আমার রহস্য আমি উদঘাটন করতে পেরেছি। শুধু একটা খটকা....

-ওঃ, আমার কি আনন্দ হচ্ছে। তাহলে আপনারও খটকা লাগে?

–শুধু আমায় একটা কথা আপনি বলুন, মিঃ স্পেন্স। যখন ইভা কেন দেশত্যাগ করে, তখনো মিঃ ক্রেগ-এর মামলার রায় বেরোয়নি, তাই না?

-না। এবং সন্তানসম্ভবা ছিল ইভা?

–হ্যাঁ।

-ওঃ, কি বোকা আমি। জলের মত তো পুরো ব্যাপারটাই সোজা। এ কথা বলার পর তৃতীয় খুনটা অল্পের জন্য হল না। মিঃ স্পেন্স, করতেন এই খুনটা, পোয়ারোকে, পুলিশ হেড কোয়ার্টারে বসে।

.

এরকুল পোয়ারো বললেন, টেলিফোনে আমি মিসেস অলিভারের সাথে একটু ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলতে চাই।

যদিও খুব ব্যস্ত ছিলেন মিসেস অলিভার, তবু এসে ফোন ধরলেন। উনি রাগতস্বরে বললেন, আঃ আপনি কি আর ফোন করার সময় পেলেন না? আমি খুনের একটা চমৎকার পরিকল্পনা করছিলাম আমার পরের বইটার জন্য। সব ভেস্তে দিলেন তো।

-এঃ হে। মাদাম বুঝতে পারিনি আমি, তবে আমি যে জন্য ফোন করেছি, তা বেশি জরুরী।

-না। আমার কাছে নয়। অন্তত আমি যতক্ষণ না আমার পরিকল্পনাটার খসড়া শেষ করে ফেলছি....হা, কি বলছেন? ....হ্যাঁ, একটা ছোট্ট থিয়েটার..... লোকেরা? হ্যাঁ, একজনের নাম সিসিল। আর যার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম তার নাম মাইকেল।

–ঠিক আছে। এটাই আমি জানতে চাইছিলাম।

–কিন্তু সিসিল আর মাইকেল কেন?

-মাদাম প্রায় গুটিয়েই এনেছি জাল।

কিছুতেই তো আমি বুঝতে পারছি না কেন ডঃ রেগুলকে আপনারা এখনো ধরছেন না। যদি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কী হতাম আমি তাহলে কবেই.....

-হ্যাঁ, মাদাম বুঝেছি। ছাড়ছি এবার।

–ছকটা যেটা কেঁদেছিলাম, তার বারোটা বাজিয়ে দিলেন।

–মাদাম অত্যন্ত দুঃখিত আমি। ফোন নামিয়ে রেখে পোয়ারো মিঃ স্পেন্সের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

-স্পেন্স, এবার আমাদের কালেন কোয়েতে মাইকেল নামে একজন অভিনেতার খোঁজে যেতে হবে। ওখানে সে খুচরো পার্ট করে। ঈশ্বর করুন, সেই যেন আসল মাইকেল হয়।

কিন্তু কি আশ্চর্য.... স্পেন্সকে আর কিছু বলার সময় দিলেন না পোয়ারো।

–আপনি কি জানেন স্পেন্স যে ফরাসী ভাষায় সিক্রেট দ্য পলিসিল কাকে বলে? না

-এটা এক ধরনের এমন গোপন কথা যা জানতে পারে সকলেই। যারা এজন্য একথা জানে না, তারা কোনোদিনই জানতে পারে না। তাদের কেউ বলেও না, কারণ সকলেই ভাবে নিশ্চয়ই একথা অন্যদের জানা আছে।

–পোয়ারো, সত্যিই পারা যায় না আপনাকে নিয়ে।

.

২৫.

শেষ হল মামলার শুনানি। বের হল রায়-এক বা একাধিক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দ্বারা খুন হয়েছেন মিসেস আপওয়ার্ড।

এরপর মামলার শুনানিতে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সবাইকে লং মিডোস-এ এরকুল পোয়ারো আমন্ত্রণ জানালেন।

অর্ধচন্দ্রাকারে বৈঠকখানায় চেয়ার সাজানো হয়েছে, বক্তার আসন পোয়ারো এসে অলংকৃত করলেন।

–সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, প্রথমেই আপনাদের বহুল প্রচলিত একটি ছড়ার কথা বলছি আপনাদের।

মিসেস ম্যাগিনটি অক্কা পেলে, কেমনে তা জানি, হাঁটু ভেঙে ঘাড় মুটকে যেমনি আছি আমি।

আমাকে এটা মিসেস আপওয়ার্ড শুনিয়েছিলেন। আর ঠিক এমনি ভাবে নিজেও মারা যান তিনি।

কথা শুরু করার আগে আবার গোড়ার দিকে আমাদের ফিরে যাওয়া ভালো।

বৃদ্ধা মিসেস ম্যাগিনটি, যিনি টুকটাক কাজকর্ম করতেন অন্যের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত তিনি খুন হলেন। আর সেই খুনের দায় বর্তালো তার ভাড়াটে জেমস বেন্টলীর ওপর। কিন্তু কেন জানি না মিঃ স্পেন্সের মনে বেন্টলীর অপরাধ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাই ওঁরই অনুরোধে পূর্ণতদন্তের জন্য আমাকে এখানে আসতে হয়। আমি দীর্ঘ গল্প কাঁদতে চাই না খুনের ব্যাপারে।

আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রথমে এক বোতল কালি। যেদিন মারা যান মিসেস ম্যাগিনটি তার আগের রবিবার সানডে কম্প্যানিয়ন এ চারজন মহিলার ছবি ছাপা হয়, আপনাদের এ পর্যন্ত সকলেরই জানা আছে। তার থেকে একটা ছবির চেহারা মিসেস ম্যাগিনটি সনাক্ত করতে পারেন। অনুমান ছিল তার–তিনি যে যে বাড়িতে কাজ করতে যেতেন, তারই কোন একটিতে ঐ একই ফটো তিনি দেখে থাকবেন। বেন্টলীকেও কথায় কথায় তা বলেছিলেন। কিন্তু সে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি তার কথায়। তবুও বেন্টলীর অস্পষ্টভাবে এটুকু মনে পড়ছে যে, ছবিটি মিসেস ম্যাগিনটি মিসেস আপওয়ার্ডের বাড়িতে দেখেছেন–এ রকম একটা ইঙ্গিত যেন দিয়েছিলেন। কারণ তিনি একথাও বলেছিলেন যে, সব জানাজানি হয়ে গেলে সেই মহিলার অহংকার চুর্ণ হবে।

আমি মিসেস আপওয়ার্ডের বাড়িতে চারখানা ফটোই নিয়ে গিয়েছিলাম। নিশ্চিতভাবে উনিও সেগুলোর মধ্যে চিনতে পারেন একজনের মুখ। সে কথা প্রকাশ পেয়েছিলো ওঁর মুখের ভাবে। আমি বারবার অনুরোধ করায় উনি বলেন যে এর কোনো একটির মত ছবি কোথাও তিনি দেখেছেন তবে কোথায় তা স্পষ্ট মনে করতে পারছেন না।

ওঁর এরকম চেনাচেনা মনে হচ্ছে কোন ছবি দেখে তা জিজ্ঞাসা করা হলে তার জবাবেউনি দেখান লিলি গ্যাম্বলের ছবিটি। কিন্তু আপনাদের আমি বলছি উনি সত্যি কথা বলেননি সেদিন। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কোনো কারণে সত্য গোপন করেন আমার কাছে। কিন্তু একজনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি উনি–সে চোখ খুনীর।

পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল একজন; আসলে মিসেস আপওয়ার্ডের কোন ছবিটা চেনা লেগেছে। ইভা কেনের ছবিখানা, যে ক্রেগ হত্যা মামলায় সর্বপ্রধান চরিত্র ছিল। ঠিক পরের দিন রাত্রে নিহত হন মিসেস আপওয়ার্ড। যে কারণে মিসেস ম্যাগিনটি খুন হন, ঠিক একই কারণে।

মিসেস আপওয়ার্ড মারা যাবার আগে টেলিফোনে তিনজন ভদ্রমহিলা ওঁর নিমন্ত্রণ পান – মিসেস কার্পেন্টার, মিসেস রেগুল আর মিস হেণ্ডারসন। তিনটি আমন্ত্রণেরই এক সারাংশ মিসেস আপওয়ার্ডকে সন্ধ্যের পর সঙ্গ দান করা। সেই রাতে ওঁর পরিচারিকাটি ছুটি নিয়েছিল। ওঁর ছেলে এবং মিসেস অলিভার কালেনকোয়েতে নাটকের ব্যাপারে থিয়েটারে গিয়েছিলেন। তার মানে ব্যাপারটা এই রকমই দাঁড়াচ্ছে অনেকটা যে উক্ত তিনজন মহিলার সঙ্গেই মিসেস আপওয়ার্ড আলাদা আলাদা ভাবে কিছু ব্যক্তিগত কথাবার্তা বলতে চান।

কিন্তু মহিলা তিনজন কেন? তাহলে কি উনি জানতেন যে, কোথায় ইভা কেনের ছবিটা দেখেছেন? নাকি ঠিক কোথায় দেখেছেন তা মনে করতে পারছিলেন না? এই তিনজনের মধ্যে কিছুই আপাতত সাদৃশ্য নেই, শুধুমাত্র তাদের বয়স ছাড়া। এদের সকলেরই বয়স ত্রিশের কাছাকাছি।

আপনারা সকলেই কাগজে পড়েছেন ইভা কেনের দুর্ভাগা মেয়েটির কথা। সেই মেয়ের বয়সও হিসেব করলে ত্রিশের কাছাকাছি দাঁড়ায় এখন। তাই এরকম ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক যে ব্রডহিনিতে এমন একজন মহিলা আছেন যিনি মিঃ ক্রেগ এবং ইভা কেনের কন্যা। এবং মেয়েটিও নিশ্চয়ই সেক্ষেত্রে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে তার এই পরিচয় গোপন রাখার, এর জন্য সে দরকার বুঝলে শেষ পর্যন্ত যেতেও প্রস্তুত থাকবে।

যখন মিসেস আপওয়ার্ডকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় তখন দুটো কফির কাপ ছিল টেবিলে। তারই একটাতে তখনো লেগে ছিল হালকা দাগ লিপষ্টিকের।

আসুন, আবার আমরা ফিরে যাই ফোনের প্রসঙ্গে। আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও মিসেস কার্পেন্টার সেই রাতে ল্যাবারনাম-এ যাননি। উনি সেইরকমই জানিয়েছেন আমাদের। ভেবেছিলাম মিসেস রেগুল যাবেন কিন্তু চেয়ারেই শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু মিস হেণ্ডারসন গিয়েছিলেন। সেই সময় বাড়িটা সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিল এবং অনেক ডাকাডাকি করে সাড়াশব্দ না পেয়ে ফিরে আসেন উনি।

ওই তিনজনের কাছে এইরকম জবানবন্দী পেয়েছি। কিন্তু তখনো সেই সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল। দ্বিতীয় কফির কাপে লিপষ্টিকের দাগ দেখা গেছে এবং একজন সাক্ষী এডনাকে আমরা পেলাম। সে নাকি হলফ করে বলে যে, একজন মহিলাকে সে ল্যাবারনামের ভেতরে ঢুকতে দেখেছে যার চুলের রং হালকা এর ওপর ঘরের ভেতর দামী সেন্টের গন্ধও পাওয়া গেল। সেন্টের বিশেষ ব্র্যাণ্ড আবার আমাদের মিসেস কার্পেন্টারের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চেঁচিয়ে উঠলেন ইভ কার্পেন্টার।

-মিথ্যে কথা, একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। আদৌ আমি যাইনি। গী, কেন তুমি বলছ না যে সত্যিই সেই রাতে আমি বাড়ির বাইরে বেরোইনি?

রাগে গী কার্পেন্টারের মুখ লাল হয়ে গেল।

-মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনি অত্যন্ত অপমানজনক কথা বলছেন।

–কি আশ্চর্য! শুধু আমি বলছি যে, আপনার স্ত্রী ওই একই সেন্ট আর লিপষ্টিক ব্যবহার করেন। তাতে হয়েছেটা কি?

–কি বকছেন যা তা। যে কেউ আমার সেন্ট নিয়ে এসে ওঁর ঘরে ছড়াতে পারেন।

হঠাৎ পোয়ারো একগাল হাসলেন।

–ঠিক তাই মাদাম, যে কেউ সেন্ট ছড়াতে পারে ওভাবে, আমাকে এই ধারণাটাই প্রথম আশার আলো দেখায়। কফির কাপ থেকে লিপষ্টিকের দাগ তুলে ফেলা বা কাপটা ধুয়ে রাখা–দুই-ই খুব সোজা কাজ, বিশেষত যখন কেউ বাড়িতে ছিল না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা করা হয়নি। কেন? একমাত্র এর উত্তর হল–কেউ দেখাতে চেয়েছিল হত্যাটা কোনো মহিলাই করেছে।

যে তিনজন মহিলা ফোন পেয়েছিলেন, তাঁরা কেউই কিন্তু মিসেস আপওয়ার্ডের সংগে সোজাসুজি কথা বলেননি। সুতরাং এমনও হতে পারে যে আদপেই ভদ্রমহিলা কোনো ফোন করেননি। কেউ এমন ফোন করেছিল যার মূল উদ্দেশ্য ছিল কোনো একজন মহিলাকে এই ঘটনার সাথে জড়িত করা। কিন্তু কেন? উত্তরও এর একটাই। মিসেস আপওয়ার্ডকে কোনো মহিলা খুন করেননি যে করেছে নিঃসন্দেহে সে একজন পুরুষ।

এরকুল পোয়ারো সমবেত শ্রোতাদের দিকে তাকালেন। ইভ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। পোয়ারো বলে চললেন, সুতরাং কোনো একজন পুরুষ মিসেস আপওয়ার্ডকে খুন করেছে এবং মিসেস ম্যাগিনটিকেও। এবং তার জিম্মাতেই নিশ্চয়ই ইভা কেনের ছবিটা ছিল। মিসেস ম্যাগিনটিকে খুন করার পর খুনী ঐ ছবিটা নষ্ট করার প্রয়োজন বোধ করেনি কিন্তু মিসেস আপওয়ার্ডকে হত্যা করার পর তোক জানাজানি হবার ভয়ে সেটা নষ্ট করে ফেলার দরকার হয়ে পড়েছিল। তবু তা নষ্ট করা হয়নি। এ বাড়িরই একটা দেরাজে সেটা আমি খুঁজে পেয়েছি। এই দেখুন, ইভা কেনের ছবি। এর পেছনে আড়াআড়ি ভাবে লেখা আছে দুটো কথা আমার মা।

-মরিন সামারহেসের ওপর স্থির হল পোয়ারোর দৃষ্টি।

মরিন অবাক হল।

–এসব তো কিছুই আমি বুঝছি না।

–না, মিসেস সামারহেস। এসব সত্যিই আপনার বুঝতে পারার পর ছবিটা রেখে দেবার দুটো মাত্র কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, নিছক আবেগপ্রবণতা। কোনোরকম

অপরাধবোধই আপনার মনে নেই। কাজেই আপনি ছবিটা রেখে থাকলে সেটা আশ্চর্যের কিছু ছিল না। নিজের মুখেই আপনি ইভ কার্পেন্টারের বাড়িতে আমাদের বলেছিলেন যে ছেলেবেলায় আপনাকে দত্তক নেওয়া হয়। বোধহয় আপনি আপনার প্রকৃত মায়ের আসল নাম পর্যন্ত জানেন না। কিন্তু আর কেউ সেটা জানেন যিনি কিনা বংশগৌরব, চক্ষুলজ্জা, এসবের ভয়ে আপনার পরিচয় গোপন করতে একটা খুনের দায়ও নিজের ঘাড়ে নিতে প্রস্তুত।

এবার চেয়ার ছেড়ে জনি সামারহেস উঠে দাঁড়ালেন।

–কি বাজে বকছেন। আপনার সবই তো মনগড়া কথা। আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে এত অসম্মানজনক কথা বলতে আপনার বাধছে না?

–মেজর, শান্ত হোন। কিছুটা শান্ত হলেন মেজর জনি সামারহেস।

–দেখুন মঁসিয়ে পোয়ারো, যে কেউ আমাদের দেরাজে ফটোটা রেখে যেতে পারে।

–ঠিক তাই, মেজর। আর মজাটা হল যে এই ফটোটার ওপর কোনো আঙুলের ছাপ নেই। যদি মরিন রাখতেন তাহলে ছবির ওপর তার আঙুলের ছাপ থাকত।

মরিন চেঁচিয়ে উঠলেন।

–কিন্তু মঁসিয়ে, আমি এ ছবি দেখিনি কখনো জীবনে, একমাত্র সেদিন মিসেস আপওয়ার্ডের বাড়িতে ছাড়া।

-হ্যাঁ মাদাম, ঠিকই বলেছেন আপনি। আমার চোখে পড়ার ঠিক আগেই এখানে রাখা হয়েছে ফটোটা। আমি দু-দুবার দেরাজের ছড়িয়ে থাকা জিনিসপত্র গুছিয়েছি। প্রথমবার ছবিটা ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয়বার ছিল। তার মানে দুবার দেরাজ গোছানোর মাঝের সময়টুকুতে কোনো এক সুযোগে ছবিটা ওর মধ্যে রাখা হয় এবং আমি জানি কে এই কাজটা করেছে।

এখন যেন পোয়ারোর চোখে শিকারীর ধূর্ততা।

–এখানে একজন অপরাধী পুরুষ। নিছক টাকার জন্যই খুন করা হয়েছে। মিসেস আপওয়ার্ডের বাড়িতে পাওয়া গেছে একটা বই। তাতে নাম লেখা ছিল ইভলিন হোপ, যে নাম ইভা কেন নিয়েছিল, ইংল্যাণ্ড ছাড়ার সময়। ইভা কেন তার বাচ্চার নামও বোঝা যাচ্ছে নিয়মানুযায়ী ইভলিন রাখে। কিন্তু ইভলিন যেমন মেয়েদের নাম হয়, তেমন আবার ছেলেদেরও হতে পারে। সানডে কম্প্যানিয়ন জানায় যে ইভা কেনের সন্তান ছিল মেয়ে। বাজে কথা। কারণ ইভ তার সন্তানের জন্মের আগেই ইংল্যাণ্ড ছাড়ে। সুতরাং নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না যে, সে কন্যা সন্তানেরই জন্ম দিয়েছিল। আমিও কাগজের খবরে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। প্রকৃত ঘটনা–ওই ইভা কেনের ছেলে ইভলিন হোপ, ইংল্যাণ্ডে আসে। সে যথেষ্ট প্রতিভাবান সুতরাং একজন বিত্তশালিনী মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যিনি ওর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। সদ্যপুত্র বিয়োগ হয়েছিল ভদ্রমহিলার। ধনী মহিলাটি আইনসঙ্গত ভাবে এই ছেলেটিকে দত্তক নেন। আচ্ছা, মিঃ আপওয়ার্ড, আপনার আসল না তো ইভলিন হোপ। তাই না?

তীক্ষ্নস্বরে রবিন চেঁচিয়ে বলল, নিশ্চয়ই না। কি বলতে চান আপনি?

-আর অস্বীকার করে লাভ নেই। আপনার আসল নাম বেশ কয়েকজন জেনে ফেলেছে। বইয়ে ইভলিন হোপ নামটা আর ছবির পেছনে আমার মা লেখাটা একই হাতের এবং তা আপনার। আপনার জিনিসপত্র গোছানোর সময় ছবিটা মিসেস ম্যাগিনটির নজরে পড়ে। উনি ছবির পেছনের লেখাটাও পড়েন।সানডে কম্প্যানিয়ন পড়ার পর ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাও বলেন। কিন্তু উনি জানতেন না যে, আপনি মিসেস আপওয়ার্ডের দত্তক নেওয়া ছেলে। উনি ভেবেছিলেন মিসেস আপওয়ার্ডই সেই ইভা কেন। পরিষ্কার আপনি বুঝতে পারেন যে মিসেস আপওয়ার্ডের কানে এ কথা উঠলে তিনি আপনাকে সত্য গোপন করার অপরাধে কখনোই ক্ষমা করবেন না আর আপনাকে তার বাড়িতেও স্থান দেবেন না। তাই খুন করার সংকল্প নিয়ে আপনি মিসেস ম্যাগিনটির বাড়ি যান এবং ওঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। ঠিক এইভাবে...।

পোয়ারো এই বলে চিনি গুঁড়োবার মুষলটা রবিনের মাথা লক্ষ্য করে তুললেন।

ভয়াবহতা এতই পুরো ব্যাপারটার নৃশংস যে, চিৎকার করে উঠল রবিন। না না, ওকে আমি মারতে চাইনি। আচমকা মাথা গরম হয়ে যাওয়ায় ওকে আমি আঘাত করি।

আপনি তারপর রক্ত ধুয়ে ফেলে অস্ত্রটা আগের জায়গাতেই রেখে দেন। কিন্তু বিজ্ঞানের দৌলতে মুছে ফেলা রক্তের দাগও ধরা পড়ে গেছে।

-কিন্তু সত্যিই আমি ওঁকে মারতে চাইনি। আমি...ভুল করে ফেলেছি। আমার রক্তে আছে খুনের বীজ কিন্তু সেজন্য আমাকে শাস্তি দিতে পারেন না আপনারা।

স্পেন্স বললেন, আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি মিঃ আপওয়ার্ড, এখন থেকে যা যা আপনি বলবেন....

.

২৬.

–ওঃ মঁসিয়ে পোয়ারো, ভাবতেই তো আমরা পারছি না যে, আপনি সন্দেহ করলেন কি করে রবিনকে।

সমবেত শ্রোতাদের দিকে পোয়ারো আত্মপ্রসাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

–আমার অনেক আগেই সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। একদিন মিসেস সামারহেস বলেছিলেন, রবিন, নিশ্চয়ই আপনার নিজেকে কারও দত্তক সন্তান হিসেবে ভাবতে ভালো লাগে না, তাই না? এর একটাই অর্থ হয় যে, মিসেস আপওয়ার্ড রবিনের আসল মা ছিলেন না। নিজেও মিসেস আপওয়ার্ড এ বিষয়ে যথেষ্ট সাবধান ছিলেন যাতে কেউ এ কথা জানতে না পারে। তাই তিনি পরিচিত গণ্ডী ছেড়ে এতদূরে বসবাস করতে আসেন। এমন কি রবিনকে যারা তার নিজের ছেলে বলে ভাবত, তাদের ভুলও তিনি ভাঙতে চাইতেন না।

প্রথমদিন ল্যাবারনাম এ যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটা হল মিসেস আপওয়ার্ডের প্রতি রবিনের ব্যবহার। ঠিক এটা আদুরে ছেলের মত ভাবও নয় আবার কর্তব্যপরায়ণ ছেলের মতও নয়, কেমন যেন প্রতিদান দেবার মত ভাব, যেমন করে আমরা অপরকে

নিজের কৃতজ্ঞতা জানাই। যদিও মিসেস আপওয়ার্ড রবিনকে ভালোবাসতেন তবু মনে মনে তার গর্ব ছিল যে, তিনি টাকা দিয়ে একজন প্রতিভাবান ছেলেকে কেমন কিনে নিয়েছেন। তারপর এলেন মিসেস ম্যাগিনটি। রবিন চোখে অন্ধকার দেখল। সে এতদিন মিসেস আপওয়ার্ডকে বুঝিয়েছিল যে তার মা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। সুতরাং সে সাহস করল না আর কোনো ঝুঁকি নিতে। একদিন মরিন কথা প্রসঙ্গে মুষলটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই সুযোগটাই নিল রবিন। মুষল দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে মিসেস ম্যাগিনটিকে খুন করল আচমকা আর মহিলাটির টাকা পয়সা চুরি করে ব্যাপারটা নিছক চোরের কাণ্ড বলে প্রতিপন্ন করতে চাইল। জেমস বেন্টলীর ওপর খুনের দায় বর্তালো। নিশ্চিন্ত হল রবিন।

আমি তারপর মিসেস আপওয়ার্ডকে সানডে কম্প্যানিয়ন এর চারখানা ছবি দেখালে উনি সেগুলোর মধ্যে ইভা কেনকে পরিষ্কার চিনতে পারলেন। কারণ তিনি আগেই এ ফটোটা দেখেছেন রবিনের কাছে। তার মায়ের ফটো সে দেখিয়েছে, তার সঙ্গে এ ছবি হুবহু এক। সন্দেহে রাগে ভদ্রমহিলা দিশেহারা হয়ে গেলেন। অথচ রবিনকেও পুরোপুরি তিনি অবিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

ব্যাপারটা জানতে পারার পর আর দেরি করতে পারল না রবিন। থিয়েটারে যাওয়া, জ্যানেটের ছুটি নেওয়া, টেলিফোন, কফির কাপ, লিপষ্টিক, সেন্ট সবই পূর্ব পরিকল্পিত। যখন রবিন মিসেস অলিভারকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে বাড়িতে ঢোকে দ্বিতীয়বার, তখনই সুযোগটা নেওয়া হয়। তার সময় লাগে খুন করতে মাত্র কয়েক মিনিট। আর মৃত্যুর পর মিসেস আপওয়ার্ডের স্বাভাবিকভাবে সব সম্পত্তির মালিক রবিনই। সকলেই ভাববেন যে, একজন ভদ্রমহিলা খুন করেছেন। সব সন্দেহের ঊর্ধে থাকবে রবিন।

কিন্তু মারাত্মক ভুল করেছিল সে দুটো।

প্রথম বই আর দ্বিতীয় ছবিটার ব্যাপারে। তার দুটোই নষ্ট করে ফেলা উচিত ছিল। রবিন ভেবেছিলেন মরিন পালিতা কন্যা সুতরাং ওঁর কাছে ছবিটা পাওয়া গেলে ইভা কেনের মেয়ে বলে ভাবা শক্ত হবে ওঁকে। অবশ্য যখন রবিন জানতে পারল মিস হেণ্ডারসন অকুস্থলে সেই রাতে গিয়েছিলেন, তখন ওর বাড়িতেই ছবিটা রাখা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে করে। কিন্তু মই বেয়ে উঠে জানলা খোলার চেষ্টা করার সময় মড উইলিয়ামসের নজরে পড়ায় তাকে সেই চেষ্টা বাতিল করতে হয়। এরপর মরিনের দেরাজে সে ফটোটা রাখার সুযোগ পায়। বুঝেছিলাম আমি, যে দুবার আমি দেরাজ দেখেছিলাম তার মধ্যবর্তী সময়ের স্বল্প ফাঁকটুকুতে একজনের পক্ষেই ফটোটা রাখা সম্ভব সে হল রবিন। সেই সময় ও বাড়ির বৈঠকখানার ঠিক ওপরের ঘরটাতেই রবিন ছিল।

ইভলিন হোপ বইতে নামটা দেখে আমি মিসেস আপওয়ার্ড আর রবিন দুজনকেই সন্দেহ করি। পরে অবশ্য একবার যে ইভ কার্পেন্টারের কথা মনে হয়নি তা নয়। তবু শেষ পর্যন্ত হঠাৎ খেয়াল হল যে ইভলিন নামটা, ছেলে বা মেয়ে যে কারুরই হতে পারে।

কালেনকোয়েতে মিসেস অলিভারের সাথে মাইকেল নামে একজন উদীয়মান অভিনেতার আলাপ হয়। ওঁদের দুজনের কথাবার্তার বিবরণী শুনে মনে হয় আমার হয়ত সত্যি কথাটা মাইকেল জানে। যাই হোক আদত ব্যাপারটা অনেক আগেই ধরতে পারা উচিত ছিল আমার। একজন কেউ আমাকে একবার রেল লাইনের ওপর ধাক্কা দিয়েছিল,

ভেবেছিলাম ধাক্কা দিয়েছে মিসেস ম্যাগিনটির হত্যাকারীই। কিন্তু স্টেশনে ওই সময় রবিনের উপস্থিতি একান্তই অসম্ভব ছিল।

হেসে উঠলেন জনি সামারহেস, হয়ত ধাক্কাটা কোনো বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা অসতর্কভাবে দিয়েছিলেন।

পোয়ারো বললেন তাই হবে। এত প্রবল রবিনের আত্মবিশ্বাস যে, সে গ্রাহ্যই করেনি আমার উপস্থিতি।

মিসেস অলিভার শিউরে উঠলেন।

-মানে আপনি বলছেন যে, আমায় গাড়িতে বসিয়ে রেখে গিয়ে রবিন খুনটা করে এল আর আমি তা ধরতেও পারলাম না।

হাসলেন পোয়ারো।–মাদাম, আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টা সেই সময় তেমন কাজ করেনি।

.

২৭.

মড উইলিয়মস বলল, আমি আর ব্রিদার অ্যাণ্ড স্কাটল এ ফিরে যাচ্ছি না। বাজে জায়গা।

পোয়ারো বললেন, যাকগে কাজ তো আপনার হয়ে গেছে।

–আপনি কি বলতে চান। মঁসিয়ে পোয়ারো?

–এখানে এসেছিলেন কেন আপনি?

–সবজান্তা তো আপনি। কিছুই কি বুঝতে পারছেন না?

–বোধহয় কিছুটা পারছি।

–কি বলুন তো?

-যদি আমার খুব ভুল না হয়, তাহলে এড়া সেদিন রাতে মিসেস আপওয়ার্ডের বাড়ির সামনে যাকে দেখে সে আপনি। যদিও মিসেস কার্পেন্টার ভেবেছে সবাই।

–কেন, আমি কেন?

–আমার একটা কথার জবাব দিন তো দেখি। আপনার এত কৌতূহল কেন ব্রডহিনির ব্যাপারে? সেদিন কেনই বা রবিনের অটোগ্রাফ চেয়েছিলেন? অটোগ্রাফ শিকারী বলে তো মনে হয় না আপনাকে দেখে। আপনি আপওয়ার্ডের সম্বন্ধে কতটুকু জানেন? কি করেই বা জানলেন যে ইভা কেন ইংল্যাণ্ড ছাড়ার সময় কি নাম নিয়েছিল আর সে অষ্ট্রেলিয়ায় মারা যায়।

-বাঃ চমৎকার কল্পনা শক্তি আপনার। যাকগে আর কিছু লুকাবো না আমি।

মড হাত ব্যাগ খুলে একটা ছোট্ট বিবর্ণ কাগজের কাটিং বের করল। পোয়ারোর খুব চেনা কাগজটা। ইভা কেনের ছবি। আড়াআড়িভাবে ছবির ওপর লেখা আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য এই মহিলাটিই দায়ী...

-মডের হাতে কাগজটা প্রত্যর্পন করলেন পোয়ারো।

মিস উইলিয়মস, আমিও ভেবেছিলাম তাই, আসল পদবী আপনার ক্রেগ, তাই না?

–হ্যাঁ। আমাদের একজন সহৃদয় আত্মীয় আমায় মানুষ করেন। কিন্তু আমি তখন নিতান্ত ছেলে মানুষ ছিলাম না। কিন্তু সব কিছুই বুঝতাম। মহিলাটি, ঐ ইভা কেন, এক জঘন্য চরিত্রের নারী। আর নেহাতই দুর্বল চরিত্রের মানুষ ছিলেন আমার বাবা। আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য আসলে ইভা কেনই দায়ী। আমার দুর্বল, ভালোমানুষ বাবা পা দেন ওর ফাঁদে। কতদিন ধরে যে ওই ইভাকে আমি খুঁজে বেড়িয়েছি, এমন কি বড় হয়ে গোয়েন্দা পর্যন্ত লাগিয়েছি, তাদের কাছেই জানতে পারি যে অষ্ট্রেলিয়ায় যায় ইভা, সেখানে ছেলে হয় তার, যার নাম ইভলিন হোপ। অষ্ট্রেলিয়াতেই মারা যায় ইভা। এরপর আমার বন্ধুত্ব হয় মাইকেলের সাথে। তার কাছে জানতে পারি অষ্ট্রেলিয়া থেকে জনৈক ইভলিন হোপ এসেছে এখানে এবং এখন তার নতুন নাম রবিন আপওয়ার্ড, যে নাকি বর্তমানে একজন উদিয়মান নাট্যকার। কিন্তু দমে যায় আমার কৌতূহল যখন শুনি যে সে তার মায়ের সঙ্গে আছে। শুনে অবশ্য মনে হয়েছিল আমার যে তাহলে ইভা মারা যায়নি, উপরন্তু রানীর হালে দিন কাটাচ্ছে। আমি এই অঞ্চলে তখন চাকরি নিই। তারপর আপনার সাথে আলাপ হতে আপনি বলেন বেন্টলীর কথা, আমার তখুনি মনে হয় মিসেস আপওয়ার্ড, ওরফে ইভা কেন, একটা খুন করেছে আবার। বাড়িতে সেই রাতে আর কেউ থাকবে না

জেনেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমি মোকাবিলা করতে যাই। ছোট্ট একটা পিস্তল ছিল আমার সঙ্গে। নিছকই ভয় দেখাবার উদ্দেশ্য....অথবা...যাক গে, দরজায় ধাক্কা দিয়ে দেখি দরজা খোলা। তারপর আবিষ্কার করি যে ভদ্রমহিলা মৃতা। বড় নাটকীয় দৃশ্য সবটাই। লোক জানাজানির ভয়ে পুরো ব্যাপারটা চেপে যাই। কেউ যে আমায় দেখেছে তা আমি ভাবতেই পারিনি। এবার বলুন, আপনি এখন কি করবেন?

পোয়ারো বললেন, কিছু না। আপনার শুভকামনা করি আমি, ব্যস।

.

পরিশিষ্ট

এরকুল পোয়ারো আর সুপারিন্টেডেন্ট স্পেন্স ভিলি গ্র্যাণ্ডমেয়ার রেস্তোরাঁয় বসে কফি পান করছিলেন।

স্পেন্স বললেন, যাক, তাহলে সব ভালোয় ভালোয় মিটে গেল।

–মিঃ স্পেন্স মনে আছে আপনার, আমি প্রথম দিন এখানেই খাওয়া সেরেছিলাম, আপনি যেদিন প্রথম এসেছিলেন আমার কাছে এই কেসটা নিয়ে?

-হা, মঁসিয়ে পোয়ারো। সব কিছু আপনি কেমন ছবির মত আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। শেষ মুহূর্তে রবিন তার স্বীকারোক্তি না দিলে অবশ্য খুব মুশকিল হত আমাদের। যথার্থ প্রমাণ বলতে তো হাতে বিশেষ কিছু ছিল না। অনুমান নির্ভর ব্যাপার সবটাই।

হু হু, ওকে আমি একটু খেলাচ্ছিলাম। ধরেই নিয়েছিল রবিন যে, আমি মরিনকে সন্দেহ করছি। আসলে ও একটা মূর্খ, ভীতু। আমার হাতে মুষলটা দেখায় ভীষণ ভয় ওকে গ্রাস করে ফেলেছিল, আর এই স্বীকারোক্তি তারই দরুন।

-কিন্তু মেজর সামারহেস খুব চটে গিয়েছিলেন, উনি আশাকরি ক্ষমা করে দিয়েছেন আপনাকে।

-হা হা, পরস্পর এখন আমরা ঘনিষ্ট বন্ধু। একটা প্রাকপ্রণালী কিনে মরিনকে উপহার দিয়েছি। আবার ওমলেট ভাজতেও শিখিয়েছি। ওঃ, যা আমার খাওয়ার কষ্ট গেছে।

-কদিন খুব গণ্ডগোল হল। অমন কেন মিসেস কার্পেন্টার চেঁচাচ্ছিল জানেন? একটু গোলমেলে ওঁর অতীতটা। উনি প্রথম জীবনে সস্তাদরের নর্তকী ছিলেন। একগাদা পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে অবাধ মেলামেশা ছিল। এখানে বিয়ের পর সুখী উনি এখন কিন্তু ওঁর খুব ভয় ছিল কেউ যদি বিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু জেনে ফেলে।

তারপর ধরুন গিয়ে ওয়েদারবিদের কথা। কি অদ্ভুত মেয়েটি, ওর এক পিসীমা প্রচুর টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন। সেগুলো হাত ছাড়া হবার ভয়ে ওর মা আর সৎপিতা ওকে বিয়েও করতে দিতে চান না। কাজকর্মে তো ভদ্রলোকটি একেবারে অপদার্থ। ওই মেয়েটিই সব খরচ করে। স্বামী স্ত্রী কেউই তেমন সুবিধের নন।

পোয়ারো ঘাড় নাড়লেন।–ঠিক, সমর্থন করি আপনার মতামত। ভাগ্যিস টাকা পয়সা আছে মেয়েটির। ওর জেমস বেন্টলীর সংগে বিয়েটা নির্বিঘ্নেই হয়ে যাবে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্পেন্স আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

কি বললেন, মঁসিয়ে পোয়ারো জেমস বেন্টলীর সংগে বিয়ে? উীডার হেণ্ডারসন? কে বলল?

-আমি বলছি। আমিই ঘটকালিটা করলাম বলতে পারেন। আমি বিয়েটাও দেব ওরা দুজন অবশ্য এখনো জানেই না। কিন্তু দুজন দুজনকে পছন্দ করে। অথচ দায়িত্ব ওদের ওপর ছেড়ে দিলে কিছু হবে না। তাই উদ্যোগী হতে হবে আমাকেই। দেখবেন, কি করি শেষ পর্যন্ত।

-ওঃ আপনার আর অভ্যেস গেল না পরের ব্যাপারে নাক গলানোর।

–কি করব বলুন? ওটা যে আবার আপনার দ্বারা হয় না একেবারেই।

–আমায় খোঁচাচ্ছেন আবার। বেন্টলী যেন কেমন ছেলেটা।

–তা যা বলেছেন। এখন হয়ত ও দুঃখে মরে যাচ্ছে ফাঁসিটা হল না বলে।

আপনার কাছে ওর উচিত নতজানু হয়ে কৃতজ্ঞতা জানানো।

–নিজে কিন্তু বেন্টলী তা মনে করেন না।

–হ্যাঁ, যা ছেলে।

-ওর সম্বন্ধে দুটি মহিলা উৎসাহী। আমি তো ভাবছিলাম আপনি ওর বিয়েটা মডের সঙ্গেই লাগিয়ে দেবেন।

বেন্টলীকে পছন্দ করতে দেওয়া হলে ও পছন্দ করবে মিস হেণ্ডারসনকেই বড় ছটফটে মড, বড় বেশি উৎসাহী। ওকে বিয়ে করলে বেন্টলী নিজেকে আরও গুটিয়ে রাখবে।

আমার মাথায় এটা কিছুতেই ঢুকছে না যে কেউ বেন্টলীকে বিয়ে করতে চাইবেই বা কেন?

-সেটাই তো রহস্য মিঃ স্পেন্স।

–যাগগে, যা ভালো বোঝেন করুন। দেখবেন, আপনাকে মিসেস ওয়েদারবি শেষ করে দেবেন।

-ভালো কাজ করতে গেলে বাধা আসবেই।

-শুনুন মঁসিয়ে পোয়ারো, আমি আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই, মনে আছে ডঃ রেগুলের কথা?

নিশ্চয়ই।

–ওঁর সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, ওঁর প্রথমা স্ত্রী লীডসে মারা যান তখন ওখানেই প্র্যাকটিস করতেন ডঃ রেগুল। পুলিশ কিন্তু উড়ো চিঠি পায়। তাতে বলা ছিল যে, নিজের স্ত্রীকে ডঃ রেগুলই বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছেন। একই কথা বলতেন

প্রতিবেশীরাও। বাইরের যে ডাক্তার পরীক্ষা করেন ভদ্রমহিলাকে তিনিও সন্দিহান ছিলেন মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে। মোটা জীবনবীমা ছিল ভদ্রমহিলার। নমিনি ছিলেন স্বামী ডঃ রেগুল, কাজেই বুঝতে পারছেন....।

মিসেস রেগুলের ভয় চকিত দৃষ্টির কথা মনে পড়ে গেল পোয়ারোর। নিজের হাতের উড়ো চিঠির দিকে ভদ্রমহিলা তাকিয়ে বলেছিলেন, আমি এসব বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না...

পোয়ারো বললেন, শুধু উড়ো চিঠি পুলিশই পায়নি। স্পেন্স বললেন, তার মানে ভদ্রমহিলাও পেয়েছেন?

জবাব দিলেন পোয়ারো, তাই মনে হয় আমার। ব্রডহিনিতে আমাকে আসতে দেখে মিসেস রেগুল ভেবেছিলেন আমি ওর স্বামীর পিছু নিয়েছি। তাই ভেবেছিলেন ভদ্রলোকও। আমায় ডঃ রেগুলই সেদিন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পেছন থেকে রেললাইনের ওপর ধাক্কা দিয়ে ফেলতে চান।

-বুঝতে পারছি, এই স্ত্রীকেও হয়ত উনি একইভাবে মারবেন।

–হ্যাঁ। বিশেষত যদি জীবনবীমা থাকে মোটা টাকার। কিন্তু যদি উনি বুঝতে পারেন যে, ওঁর ওপর পুলিশ নজর রাখছে, তাহলে আর কোনো ঝুঁকি নেবেন না উনি।

-দেখি, কতদূর কি করতে পারি। ওঁকে আমরা বুঝিয়ে দেব যে, আমাদের নজর আছে ওঁর ওপর।

–আসুন, মিসেস অলিভারের সুস্বাস্থ্য কামনা করে গ্রহণ করা যাক পানীয়টা।

–কেন মিসেস অলিভার?

–ওঁর বরাবরই ডঃ রেগুলের ওপর একটা অদ্ভুত সন্দেহ ছিল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ধীরে ধীরে স্পেন্স বললেন, আগামী সপ্তাহে রবিনের মামলার শুনানী শুরু। মঁসিয়ে পোয়ারো, এখনো অল্প অল্প সন্দেহ হচ্ছে যে আমার....

শশব্যস্তে তাকে পোয়ারো থামিয়ে দিলেন।

–মিঃ স্পেন্স, আপনার এখনো সন্দেহ গেল না? রবিন সত্যিই দোষী। আবার তদন্ত শুরু করার দাবী জানাবেন না দয়া করে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্পেন্স এক গাল হাসলেন।

-না না, মঁসিয়ে পোয়ারো সত্যিই রবিন খুনী। আর কোনো সন্দেহই আমার নেই, সব রকম অপকর্মই করা সম্ভব ওর দ্বারা।